পরলোক দর্শন

——•:•:•——

والآخرة خير وابقى - قرآن

"পরকাল শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী"—'কোর-আন্।'

মহাম্মদ আমিন উল্লাহ,
প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র:

ভূমিকা

• বিষয়ের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই "পরলোক দর্শন" লিখিবার জন্য লেখনী হাতে করিয়াছিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর নিজের অযোগ্যতা ধরা পড়িল—তখন মনে করিলাম এই দুঃসাধ্য সাধনে হস্তক্ষেপ করা কিছুতেই আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। যে সোলতান জমজমার আখ্যায়িকা লইয়া এই পরলোক দর্শনের সূচনা ও পরিসমাপ্তি তাহা নিতান্ত শিক্ষাপ্রদ একটী পুরাতন ইতিবৃত্ত। সেই কৈশোরের অজ্ঞানতা বহুল দিবস হইতে আজ জীবনের ত্রিংশবৎসর পর্য্যন্ত কতবার এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি ; কিন্তু যত শুনি ততই শুনিতে ইচ্ছা হয়—যত পড়ি ততই পড়িবার সাধ বাড়িয়া যায়। মনে করিয়াছিলাম সেই অপূর্ব্ব কাহিনী শৃঙ্খলামত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু পৌরাণিক বিশৃঙ্খল ইতিহাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। এই দুঃসাহসিকতায়ও কেহ কেহ সিদ্ধহস্ত প্রতিপন্ন হন—যশের মুকুট শিরে ধারণ করিয়া লোক-সমাজে আদৃত হইয়া থাকেন, আবার কাহারও বা যত্ন ও আয়াস পণ্ড হয়—অধিকন্তু পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ কলঙ্কের ডালিই মাথায় লইতে হয়। আমার ন্যায় অযোগ্য লেখককে, পৌরাণিক বিশৃঙ্খল ইতিহাস

শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে যাইয়া যে কলঙ্কের ডালি মাথায় লইতে হইবে, তাহা হয়ত স্থির নিশ্চয়।

বিংশ শতাব্দীর এই উন্নত যুগে অধিকাংশ লোকজনই যেন আর তেমন অযৌক্তিক ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ শুনিতে ইচ্ছুক নহেন। ধর্ম্মের যে অংশটুকু বিজ্ঞান ও মীমাংসা শাস্ত্র বহির্ভূত তাহা যেন আর কেহই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, নিতান্ত সীমাবদ্ধ জীব, সামান্য জ্ঞানগরিমায় অন্ধ হইয়া, জ্ঞানাতীত বিশ্ব-নিয়ন্তার কার্য্যকলাপে দোষারোপ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না! স্থান বিশেষে ইহাও দেখা গিয়াছে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবে কেহ কেহ আজাবের কথাগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বিবেচনা করেন! অবশ্য ব্যক্তিগত মতামত সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু কোর-আন্ যখন আজাবের কথা বজ্র নির্ঘোষে প্রচার করিতেছে, তখন তাহা অযৌক্তিক প্রমাণ করিবার মত যুক্তিও ত তেমন কিছু দেখিতেছি না। ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি আছে—আঘাতের যেমন প্রতিঘাত আছে—অসদাচরণের যেমন কুফল আছে—তদ্রূপ পাপেরও একটা বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত না থাকার চেয়ে, থাকাই সম্ভব। এই সমস্ত স্থির ভবিষ্যতের উপর লোকজন অল্প বিস্তর আস্থা শূন্য হওয়াতেই তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস দিন দিন অধিকতর শিথিল হইয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে এই ধর্ম্মহীনতাই আমাদের অবনতির একমাত্র কারণ। ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা যে জাতির মধ্যে বিদ্যমান—যে জাতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাণপণ

করিতে অসমর্থ—যে জাতি ধর্ম্মের যাবতীয় বিধান বিনা যুক্তি-তর্কে মাথায় তুলিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করে—সে জাতির উন্নতি কিংবা পুনরুত্থান সুদূর পরাহত! জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সকল সম্প্রদায় উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যখন যাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে, তখনই শত বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক পায়ে ঠেলিয়া তাঁহাদের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি মার্গে আরোহণ দৃষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে উন্নত জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-হীনতা ও তদানুষঙ্গিক অসদাচরণ, বিলাসিতা ও চরিত্র-হীনতা ইত্যাদি স্থান লাভ করে, সে জাতি তখন হইতে অধঃপতনের নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে নীত হইতে থাকে। ধর্ম্মবলেই একদিন মুসলমানগণ মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ভূমধ্য-সাগর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর এখন তাঁহাদের ধর্ম্ম-বল ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিতে কিছুই নাই! হায়, এ পরিতাপ রাখিবার স্থান কোথায়! যাহাতে বর্ত্তমান অধঃপতিত মোস্‌লেম সমাজের স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র একনিষ্ঠা ও ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানার একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রায় সমাজ-সংস্কার হয়—যদি একটী ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খল মানবও সোলতান জমজমার এই মর্ম্মান্তিক "পরলোক-দর্শন" পাঠে সন্তপ্ত হইয়া সৎ-পথে আগমন করে, তবে যাবতীয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

হজরত ইলিয়াছের (আঃ) সময় হইতে কিরূপে চতুর্দ্দিকে নিরীশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়া বানি-ইস্রায়েল * বংশকে ভ্রমান্ধকারে নিমজ্জিত করিতেছিল ও সোলতান জমজমা. কোন বংশ সম্ভূত শুধু এইটুকু দেখাইবার জন্যই ইলিয়াছের (আঃ) কথার অবতারণা করা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে, আমাদের পাঠক পাঠিকাদের কাহারও হয়ত পুনর্জ্জন্ম বাদ সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এ জন্যই বলিতে বাধ্য হইলাম যে ইস্‌লাম পুনর্জ্জন্ম বাদের একান্ত বিরোধী। একটী মাত্র ঘটনা হইতে চিরন্তন সত্যতার উপর অবিশ্বাসের রেখা পাত করা একান্ত অনুচিত, উপরন্তু ইহা ইস্‌লাম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত পোষক—ইহা প্রেরিত পুরুষের মোজেজা অথবা জমজমার উপর পরম কারুণিক খোদাতা'লার অহেতুকী করুণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইতি—

জালিয়াল, নোয়াখালী,
শ্রাবণ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

* হজরত এয়াকুব বা ইস্রায়েলের (আঃ) বংশধর।
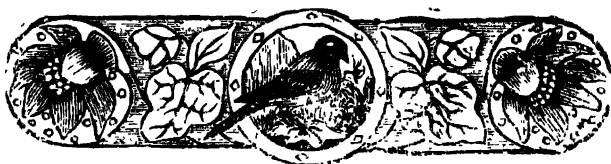
পরলোক দর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

---:•:---

দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে দৈনন্দিন জগতের কত কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। আজ যে স্থানে হিংস্র-জন্তুসমাকীর্ণ ভয়াবহ অরণ্য, কাল সে স্থানে মনোহর নগর ও উপনগরের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। আজ যে স্থানে অসংখ্য আদিম নিবাসীর বসবাস, কাল সে স্থানে বহুতর জ্ঞানগরিমা-দীপ্ত সুসভ্য জাতির আবির্ভাব হইতেছে। আজ যে স্থানে অন্ধ-কার চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে, কাল

সে স্থানের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণচ্ছটায় লোকচক্ষু ঝলসিয়া উঠিতেছে। আজ যাহার ভাগ্যাকাশ ঘন জলদ-জালে আবৃত, কাল তাহার ভাগ্যাকাশে সহস্র শশীর উদয়ও অসম্ভব নহে। আজ যে স্থানে সপ্তসিন্ধু তরঙ্গের উপর তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া আপন মনে বহিয়া যাইতেছে, কাল সে স্থানে অসংখ্য সৌধমালা, বহুতর কৃত্রিম উৎস ও বিলাসভবনের সৃষ্টি হইতেছে। জগতের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতালা কোথাও বা প্রকৃতি সতীকে সর্ব্বগুণসম্পন্না নিটোল যোড়শী রূপসী করিয়া তুলিতেছেন, আবার কোথাও বা তাহার পূর্ব্বশ্রী ও সম্পদ্ হরণ করত তাহাকে বিগত-যৌবনা, বিগত-সৌষ্ঠবা, ঘৃণা ও উপেক্ষার লীলাভূমি করিয়া তুলিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না!

এই পরিবর্ত্তনের বহুকালব্যাপী বিষম ঝঞ্ঝাবাতে সিরিয়া রাজ্যেরও সেই পূর্ব্বগৌরব ও সমৃদ্ধি সমস্তই লোপ পাইয়াছে। এখানে কত রমণীয় বিলাসভবন, কত চিত্তাকর্ষক হেরেম ও কত খোসমহল যে বিরাজিত ছিল, এত যুগ-যুগান্ত অন্তে আজ তাহার সংখ্যা করিতে যাওয়া ব্যর্থপ্রয়াস বই আর কিছুই নহে। এই স্থান যে এককালে একটী আদর্শ রাজধানী ছিল, তাহা যেন এখন কল্পনার কথা হইতে চলিয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে বহু শতাব্দীর কথা। তখন হজরত ইলিয়াছ নবীর (আঃ) বংশধর সোলতান জমজমা এই সুবিশাল

সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। তৎকালে পৃথিবীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সীমার মধ্যে সোলতান জমজমার ন্যায় জ্ঞানাভিমানী, বিচক্ষণ, রাজনীতিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী সম্রাট্ আর দ্বিতীয় ছিলেন না। তিনি পৃথিবীর যে কোন জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে পরাজিত না করিয়া কখনও রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। ফলতঃ সোলতান জমজমার বিরক্তিভাজন হইয়া তৎকালে বাদশাহদের ভূমণ্ডলে জীবন ধারণ করাই যেন দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি যখন মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন, সোলতান জমজমা তখনই তাঁহাকে পরাজিত ও পদদলিত করিয়া স্বকীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। নিঃসন্দেহ রূপে বলা যাইতে পারে যে, তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বসম্পূরিত জীবনকাহিনীতে তিনি কখনও কাহারও হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার অপরিসীম বাহুবল, অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক রণ-কৌশলসমূহ স্মরণ করিলে, আজও মানবহৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। এক কথায় বলিতে গেলে তৎকালে সোলতান জমজমা 'বিশ্ববিজয়ী' আখ্যায় আখ্যাত হইতেন। তদীয় যুদ্ধসময়ের জ্বলন্ত উৎসাহবাণী সৈন্য-সামন্তের শিরায় শিরায় যেন এক অভাবনীয় অনলপ্রবাহের সৃষ্টি করিত। মুমূর্ষু সেনার অন্তরেও সেই ওজস্বিনী

উৎসাহবাণী যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব নবীন আশার আলোক ও বিজয়-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যপরিচালনা কালীন সোলতান জমজমা যেমন একদিকে অদ্বিতীয় সেনাপতি ছিলেন, তেমনি অস্ত্র ধারণ করিলে জগতের বাদশাহগণ সেই সময়কে যেন প্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণ বলিয়াই গণ্য করিতেন। সোলতান জমজমা রণক্ষেত্রে সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী ও আবাসে মেষদৃশ শান্ত ছিলেন। তিনি রণক্ষেত্রে সংহারক মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেন বটে, কিন্তু রাজধানীতে শান্তিতে অবস্থান কালে তাঁহার দয়া ও সৌজন্য অতুলনীয় ছিল। ইহাই মানবচরিত্রের বিশেষত্ব।

অঙ্গের শ্রী-সৌষ্ঠবে তিনি যে প্রকার সুপুরুষ ছিলেন তদ্রূপ তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধিও অসাধারণ ছিল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, তাঁহার শৈশবের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও যুদ্ধ অনুশীলনের ঔৎসুক্য দর্শন করিয়া, তদীয় মাতা পিতা অতি শৈশবেই তাঁহার ভবিষ্যৎ নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবী কালে এক অতি বীরপুরুষরূপে জগতে অবতীর্ণ হইবেন, জগতের তৎসাময়িক রাজন্যবর্গ যে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকারে নতমস্তক হইবেন, ইহার নিদর্শন জমজমার জীবনের প্রত্যূষেই সূচিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন ও আলেকজেণ্ডার যে প্রকার বিশ্ববিজয়ী বীর পুরুষরূপে গণ্য হইবেন বলিয়া তাঁহাদের মাতা

পিতা অতি শৈশবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, জমজমার জীবনেও তাহাই সংঘটিত হইয়াছিল। প্রভাতের প্রথম সূর্য্যরশ্মি দর্শন করিলেই মানবগণ যেরূপ দিবসের গতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, তদ্রূপ বীর পুরুষদের শৈশবের গুণপনা দর্শন করিলেই, তাঁহাদের ভাবী উন্নতির এক মনোহর চিত্র স্বতঃই মানবনেত্রে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জমজমার সেই সুপ্রশস্ত ললাটদেশ, আজানু লম্বিত বাহুদ্বয়, দৃষ্টিশক্তির অমানুষিক তেজস্বিতা, সুপ্রশস্ত বক্ষদেশ ও বিশ্বশিল্পীর একান্ত যত্নবিন্যস্ত সুগভীর চক্রমধ্য-মণ্ডল, দর্শন করিলেই এতৎসম্বন্ধীয় যে কোন অবিশ্বাস তৎক্ষণাৎ মানবহৃদয় হইতে এককালে অন্তর্হিত হইত।

বিদ্যা-বুদ্ধির এবং বৈজ্ঞানিক ও তর্ক শাস্ত্রের সর্ব্বভেদিনী প্রতিভার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিকে সোলতান জমজমা রাজ্য বিস্তারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিলেন, তেমনি অপর দিকে যেন অলক্ষিত ভাবে হৃদয়ের মানুষকে হারাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। এই অপরিসীম ভব-কাণ্ডের যে কেহ স্বষ্টিকর্ত্তা আছেন, কিংবা মানবের সুখ দুঃখ ও সৌভাগ্য যে কাহারও দ্বারা অলক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, মৃত্যুচিন্তা-বিরহিত ভুজবলাভিমানী সোলতান জমজমার হৃদয় হইতে যেন ধীরে ধীরে এই কথাগুলি মুছিয়া যাইতে লাগিল। সাধারণতঃ কতিপয় অলীক ঐশ্বর্য্যমদমত্ত জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি যেমন ঈশ্বরের প্রতি

আস্থা হারাইয়া নরকের পথ আশ্রয় করিয়া থাকেন, জমজমার জীবনেও তাহাই সংঘটিত হইয়াছিল। যিনি সর্ব্বমঙ্গল-আধার, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি জ্ঞানেরও জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকেই তিনি সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিবার পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি একাগ্রচিত্তে কখনও ঈশ্বরসমীপে নতজানু হন নাই। জমজমা বুঝিয়াছিলেন—এই ভাবেই তাঁহার চিরদিন কাটিয়া যাইবে। হঠাৎ যে তাঁহার এক-দিন ডাক পড়িবে অথবা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় পরিজন পরিত্যাগ করত হঠাৎ যে তাঁহাকে পরলোকের পথে চলিয়া যাইতে হইবে কিংবা জীবনের পরপারে তাঁহাকে যে কোন কালে কোন হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে, ইহা কস্মিন্ কালে স্বপ্নেও জমজমার মনোমধ্যে স্থান পায় নাই। হায়, কি শোচনীয় পরিণাম! ভ্রমেই মানবের ভ্রমময় জীবন প্রতিদিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সিরিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী নগর নগরী যখন নিরীশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতার প্রবল ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, তখন জগতের উদ্ধারকল্পে পরম কারুণিক খোদাতা'লা তদীয় ভাববাদী হজরত ইলিয়াছ নবীকে (আঃ) জগতে প্রেরণ করিলেন। তিনি শৈশবাবধি পৌত্তলিকতা ও নিরীশ্বরবাদের একান্ত বিরোধী ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন নবুয়ত হাছেল * হইল, তখন তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। হজরত হারকিল (আঃ) ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণ আজীবন যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়াও তওরাতের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, সে কথায় ইলিয়াছের (আঃ) হৃদয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি বিবেচনা

---

* পয়গাম্বর পদ প্রাপ্তি।

করিতে লাগিলেন, "যে কার্য্য সাধন করিতে যাইয়া বহুব্যক্তি বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই কার্য্য সাধন করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। বিশেষতঃ যদি একার্য্য আমা কর্ত্তৃক সাধিত হওয়া অসম্ভব হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বদর্শী খোদাতালার আমার মত অযোগ্য ভাববাদীকে জগতে প্রেরণ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। আমি যখন এতদর্থে অবতীর্ণ হইয়াছি, তখন প্রাণপণ চেষ্টা করিব। এক-দিন না একদিন আমার চেষ্টা অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে। তবে ভোগের মধ্যে এই হইতে পারে যে, যথেষ্ট লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান বুক পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে। আমি সেই জন্য কখনও অপ্রস্তুত নহি। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমানকে ভয় করিলে কোনদিন জগতের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, একদিন না একদিন বানি-ইস্রায়েল বংশ আমার ধর্ম্মো-পদেশ অনুসরণ করিবে। নিশ্চয়ই অচিরে বানি-ইস্রায়েলদের ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইয়া, চৈতন্যরূপী-রবি-কর-স্পর্শে অকস্মাৎ তাহারা ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। আজ হউক, কাল হউক, অবশ্যই তওরাৎ প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম জগতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

মানব যাহা মনে করে তাহাই যদি কার্য্যে পরিণত হইত,তবে জগতের আর এই অবস্থা দেখা যাইত না। তাহা হইলে সকলেই

ধনজনশালী হইত, সকলেই সুখী হইত, কিংবা সকলেই স্বকীয় অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইত। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াও নিজের অভীষ্ট সাধনে অতি অল্পই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সিরিয়ার তৎকালীন অধীশ্বর তৈফুরকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে যাইয়া, তিনি তাঁহার বিরাগ-ভাজন হইলেন। তৈফুর বাদশাহের সহধর্ম্মিণী বেগম বিল সাহেবাও বড় সহজ পাত্রী ছিলেন না। তিনি আশৈশব ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন। হজরত ইলিয়াছের (আঃ) মুখে একেশ্বর-বাদের কথা শুনিয়া অবধি তিনিও তাঁহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন, তাঁহার স্বামী হজরত ইলি-য়াছের (আঃ) উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছেন, তিনিও তখন সুযোগ বুঝিয়া সেই ধূমায়মান বিরক্তি-অগ্নি-কণার উপর বিরাগ, অশ্রদ্ধা ও পৌত্তলিকতা জড়িত পাখা সংযোগে ব্যজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে যে ভীষণ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে দগ্ধ না হইলেও হজরত ইলিয়াছ (আঃ) কে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল।

বেগম বিলের অনিন্দ্য সুন্দর রূপলাবণ্য, সুমধুর বাক্য-বিন্যাস ও সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা তৎকালীন রাজন্যবর্গের প্রাণে কি যেন মোহের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সৌন্দর্য্য-সুধা পানের আকাঙ্ক্ষায় সিরিয়া রাজ্যের অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয়

সংঘটিত হইয়াছিল। বেগম বিলকে লাভ করিবার জন্য সিরিয়ায় কতবার যে কত যুদ্ধবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল ও কত সুপুরুষ যে অকালে কালের পথে চলিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। এইরূপে সিরিয়ার সিংহাসন হস্ত হইতে হস্তান্তর লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু চতুর্দ্দিকে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া যিনিই যখন সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই বেগম বিলকে লাভ করিয়া নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। ফলতঃ বেগম বিলকে লাভ করা যেন তৎকালে পরিশ্রম ও প্রাণহানির পুরস্কারস্বরূপ ছিল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সিরিয়ার সাতজন বাদশাহের সহিত বেগম বিল পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে প্রভূত ক্ষমতাশালী বাদশাহ তৈফুরের ভাগ্যেই এই কিন্নরীরূপ উপভোগ ঘটিয়াছিল। সৌন্দর্য্যের কি মোহময় প্রভাব! নারী-সৌন্দর্য্য কি ভয়ানক বস্তু!!

স্ত্রীলোকগণ পুরুষকে বিপথগামী করিবার প্রয়াস পাইলে, তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। কাণের কাছে খারাপ কথাও দু'দশদিন বলিতে বলিতে ভাল লাগিয়া উঠে। বিশেষতঃ মনঃপূত রমণীর কোন প্রকার অনুরোধ উপেক্ষা করা, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যুবক-নেত্রে যেন আপাততঃ পাপ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কুমন্ত্রণা-পরবশ কুহকিনী স্ত্রীলোকের হাতে পড়িয়া সাধারণতঃ স্ত্রৈণ লোকগণ তন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্রতী হইয়া, যেমন

নরকের পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তৈফুর বাদশাহের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি বেগমের পরামর্শ অনুসারে যে প্রকারেই হউক ইলিয়াছের (আঃ) প্রাণ হরণ করত জগন্ময় পৌত্তলিকতা সংস্থাপন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সৈনিক পুরুষ হইতে ঘাতক (জল্লাদ) পর্য্যন্ত সকলকেই বলিয়া দিলেন "তোমরা যে, যেস্থানে যে সুযোগে পার ইলিয়াছকে (আঃ) বধ কর। তাহার মস্তক আনিয়া আমার দরবারে উপস্থিত করামাত্র যথেষ্ট পুরস্কার লাভ হইবে।" সকলেই রাতারাতি বড় লোক হইবে ভাবিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। হায় অর্থ লালসা! তোমার কি সর্ব্বমোহিনী শক্তি! তোমার কি অপরিসীম প্রভাব! তোমার জন্য লোক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, এমন কি খোদার অনভিপ্রেত কার্য্যে ব্রতী হইতেও কুণ্ঠিত হয় না! সংসারী তোমার জন্য না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই! এই জন্যই জ্ঞানিগণ বলিয়া গিয়াছেন—"অর্থই সকল অনর্থের মূল।"

এদিকে হজরত ইলিয়াছ (আঃ) প্রাভাতিক নামাজ সমাধা করত তন্ময়চিত্তে মোনাজাতে মসগুল * আছেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে করুণ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে দরদরধারায় অশ্রু বহিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে; তিনি যেন আর হৃদয়ের

---

* করপুট প্রার্থনায় মগ্ন।

বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে যেন বিফল-মনোরথজনিত প্রবল উৎপীড়নে শতধারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। বসন্তের প্রাভাতিক স্নিগ্ধ মলয় পবন তাঁহার প্রাণে শান্তি ঢালিয়া দিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার সে দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি যে জগতের জন্য কাঁদিতে ছিলেন—জগতের মঙ্গলাধার বিশ্বকর্ত্তা ব্যতীত এই অশ্রু মুছাইবার অপর আর কে আছে? আমরা নিজের দুঃখে কাঁদিয়া থাকি, আর মহাপুরুষগণ অপরের জন্য কাঁদিয়া থাকেন। তজ্জন্যই আমরা এত ক্ষুদ্র, আর তাঁহারা মহানুভব ও ঈশ্বরের নিয়োজিত ভাববাদী। আমরা হয়ত নিজের আত্মীয় স্বজন কিংবা স্ত্রী-পুত্রের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, কিন্তু একজন পয়গাম্বর কখনও তাহা করিতে পারেন না। তিনি আত্ম ও আত্মীয় বলিতে সমস্ত ভুলিয়া, সমস্ত জাতি, সমস্ত মানব-সম্প্রদায় কিংবা সমস্ত জগতের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

এত কাঁদিয়াও ইলিয়াছের (আঃ) প্রাণে শান্তি আসিল না। যতক্ষণ বুকের দুঃখ মুখ ফুটিয়া বাহির না হয়, ততক্ষণ হৃদয়ের দুঃখ, হৃদয়ের ভার ও হৃদয়ের জ্বালা-যন্ত্রণার লাঘব হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই যেন তাঁহার বিষাদ-বিজড়িত মুখারবিন্দ হইতে অতি মৃদু স্বরে এই কথাগুলি শুনা

যাইতে লাগিল—"খোদাওন্দ করিম, তোমার শক্তি অপরিসীম; তুমি ইচ্ছা করিলে বানি-ইস্রায়েল বংশ কেন, সমস্ত জগতকে সুপথে আনয়ন করিতে পার। তুমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রাণে মুহূর্ত্তমধ্যে সদ্ভাব ও সুমতি সঞ্চার করিতে পার। তুমি সমস্ত নির্জ্জীব জগতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছ। কাহার হৃদয়ের কোন্ নিভৃত স্থানে কি দোষ আছে তুমি বুঝিতে পার। ইচ্ছা করিলে সেই দোষ অপনোদন করা তোমার পক্ষে সময়সাপেক্ষ নহে।" ইলিয়াছের (আঃ) প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে অকস্মাৎ তাঁহার জীর্ণ কুটীর যেন শত আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ত্রিদিবের অলৌকিক কুসুমসৌরভে যেন চারিদিক্ ভরপূর হইয়া উঠিল। গৃহের সামান্য আসবাব ইত্যাদির উপর যেন শত শত মণি মাণিক্য ঝলসিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, মোনাজাত শেষ করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে পশ্চাতে অবলোকন করা মাত্র দেখিতে পাইলেন, স্বর্গীয় দূত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে কি যেন বলিবার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইবা মাত্র তাঁহার আর যেন বিলম্ব সহ্য হইল না। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বাদশাহ তৈফুর আপনাকে বধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি এখনই সিরিয়ার কোন নিভৃত পর্ব্বতগুহায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ

করুন।” ইলিয়াছ (আঃ) বিনাবাক্যব্যয়ে তখনই পলায়ন করিলেন।

ইলিয়াছ (আঃ) প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলায়ন করেন নাই, পরন্তু খোদাতা'লার আদেশ পালনার্থেই পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে প্রাণের ভয় করিয়া, জগতের কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। যিনি প্রাণের ভয়ে ভীত ও শঙ্কিত, তদ্দ্বারা কোন জাতির, কোন সমাজের কিংবা বিশ্ববাসীর হিত-সাধন একান্ত অসম্ভব। যিনি স্বকীয় স্বার্থে একান্ত উন্মনস্ক, যিনি জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যিনি পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তিনি যে জগতের মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট পূজ্যপাদ ব্যক্তি, তাহা তিনি পরিণত বয়সের প্রারম্ভেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া-ছিলেন। এই হেতু লোকজনের হিতসাধন করিতে আসিয়া, তাহাদের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করা মধ্যে মধ্যে ইলিয়াছের (আঃ) পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। যখনই এইরূপ চিন্তা-স্রোত তাঁহার হৃদয়মধ্যে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ সৃষ্টি করিত, তখনই ঈশ্বর-আদেশরূপ ভাটা আসিয়া সেই তরঙ্গমালাকে নীরব ও নিস্তব্ধ করিয়া দিত।

এইরূপে নির্জ্জনবাসে দেখিতে দেখিতে ইলিয়াছের (আঃ) সাতটী বৎসর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘ সাত বৎসর কাল ইলিয়াছ (আঃ) সমস্ত দিন রোজা রাখিতেন এবং দিনরাত্রির

মধ্যে প্রায় সমস্ত সময়ই ঈশ্বর-আরাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইহাই প্রার্থনা করিতেন, "হে খোদাওন্দ-করিম, তুমি বানি-ইস্রায়েল বংশকে সুমতি দান কর। তুমি তাহাদের অন্তঃকরণের মধ্যে ঈশ্বর-আরাধনা ও ঈশ্বর-ভক্তির বীজ বপন কর। যে রূপেই হউক তাহাদের মুক্তির উপায় কর।"

এদিকে বাদশাহের লোকজন ইলিয়াছের (আঃ) খোঁজ করিয়া কোথাও তাঁহার কোন সন্ধান করিতে পারিল না। অর্থ-লোলুপ ছদ্মবেশী কর্ম্মচারিবৃন্দ পুরস্কার-প্রত্যাশায় পাহাড়, পর্ব্বত, নিবিড় কানন হইতে আরম্ভ করিয়া যে যে স্থানে জন-প্রাণীর যাতায়াত সম্ভবপর নহে, এরূপ সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ বাদশাহের একমাত্র পুত্র সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপ-ক্রম হইল। ডাক্তার, কবিরাজ, তবিব ও হাকিম প্রভৃতির চিকিৎসায় কিছুমাত্র ফললাভ হইল না। অতঃপর নিরুপায় হইয়া তাঁহাদের চিরপূজ্য জীবিতেশ্বরের * নিকট কত কি মানস করা হইল। জীবিতেশ্বর যেন সে বার তাঁহার প্রার্থনায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করিল না। এতদ্দর্শনে চাটুকার পূজারিদল বাদশাহকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, যাবৎ ইলিয়াছকে (আঃ) বধ করিয়া

* দেবতা বিশেষ।

চারিদিকে প্রগাঢ়রূপে প্রতিমাপূজা প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, তাবৎ কিছুতেই দেবতার যথোচিত সম্মান রক্ষা হইতেছে না। সুতরাং দেবতা হইতে ততদিন আমাদের কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা যদি তাঁহার প্রতি উপযুক্ত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের দুঃখে তাঁহার অন্তর বিগলিত হইবে কেন? বুঝিতে গেলে আমরা যাহার যতটা স্নেহভাজন, তাহার নিকট ঠিক ততটা আবদারই আমাদের গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

সন্তান-বৎসল ভূপতি পূজারিদের এই কথাগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলেন। তাহাদের কথা শেষ হইতে না হইতে বাদশাহ সৈন্য-সামন্ত, গোয়েন্দা ও ঘাতকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হুকুম পাওয়া মাত্র সকলে ত্রস্ত ভাবে দরবারে আসিয়া, বাদশাহকে যথারীতি কুর্ণিশ ও অভিবাদন করত করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। বাদশাহের তৎকালীন সংহারক মূর্ত্তি, রোষকষায়িত সুবৃহৎ নয়নদ্বয় ও কুঞ্চিত ললাট-দেশ দর্শন করিয়া সকলেই বিষম প্রমাদ গণিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ নীরব। কাহারও মুখে কথাটী মাত্র নাই। এই আকস্মিক বিপদে সকলের অন্তরাত্মাই নীরবে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাদসাহ সিংহগর্জ্জনে নীরবতা ভঙ্গ করিরা বলিতে লাগিলেন, নেমকহারামগণ, তোমরা রাজ-আজ্ঞা অবহেলা

করিয়াছ। সুতরাং তোমরা স্ত্রী-পুত্র সহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আজ সাত বৎসর অতীত হইতেছে, তোমাদিগকে যে যেখানে, যে সুযোগে পার, ইলিয়াছকে (আঃ) বধ করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। তোমরা তাহাকে বধ করা দূরে থাকুক, সে কোথায় আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত আনিতে পারিলে না। ইলিয়াছ (আঃ) ত আমার রাজ্য হইতে পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া যায় নাই, অথবা মরিয়া কবরেও গমন করে নাই, যে তোমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাইলে না। তোমাদের অকৃতকার্য্যতাজনিত কোন কথাই আমি শুনিতে প্রস্তুত নহি। আমি এখনও তোমাদের পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আদেশ করিতেছি যে, যদি নিজের প্রাণের মমতা থাকে, যদি কিছুকাল স্ত্রী-পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া সুখী হইতে চাও, তবে ইলিয়াছের (আঃ) মস্তক আনিয়া আমার দরবারে হাজির করিতে হইবে। লোকের অপ্রাচুর্য্যহেতু যদি কার্য্যসাধনে কোন বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, তবে দুর্গও রাজধানী রক্ষার উপযোগী লোকজন রাখিয়া, অপর সমস্ত লোক ইলিয়াছের (আঃ) হত্যাকল্পে বহির্গত হও। বড়ই পরিতাপের বিষয়, তোমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না যে, ইলিয়াছকে (আঃ) বধ করিতে না পারায়, জীবিতেশ্বরের অভিসম্পাতে যুবরাজ অকালে মরিতে বসিয়াছে। তোমরা যদি একদিনও আমার অর্থে লালিত পালিত

হইয়া থাক, যদি তোমাদের অন্তরে প্রভুভক্তি কিঞ্চিৎ মাত্রায়ও স্থান পাইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রাণপণে প্রভুর আদেশ পালনে কৃতসঙ্কল্প হও। প্রভুভক্তি প্রদর্শনের তোমাদের এই-ই উপযুক্ত সময়।” বাদশাহের কথা শেষ হইলে তিরস্কৃত সৈন্য-সামন্তগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিষণ্ণ মনে বিদায় গ্রহণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেনাপতির মস্তক শকট চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। কিসে কার্য্যোদ্ধার হইবে, কি করিলে তদুপরি রাজ-প্রসাদ অক্ষুণ্ণ থাকিবে; এ কথাগুলি ওতপ্রোত ভাবে তাঁহার মস্তিষ্কে বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহার কার্য্য-কৌশল, নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার রজত-শুভ্র বসন-ভূষণে মসী-বিন্দু স্পর্শ করিবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া, তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। কি করিলে পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কি করিলে নাম-যশ বজায় থাকিবে, কি করিলে সকল দিক্ রক্ষা পাইবে; এ সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অন্তর চিন্তা, ক্ষোভ ও বিষাদ-বিহ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তর ও মস্তিষ্ক উভয়ে একত্র পরিচালিত হইয়াও কোন উপায় নির্দ্ধারণে সক্ষম হইতেছিল না। তিনি করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া নীরবে মনোমধ্যে

কিসে কার্য্যোদ্ধার হইবে, তাহাই পর্য্যালোচনা করিতে লাগি-
লেন। তাঁহার বিষণ্ণ বদনকমল, চিন্তাভারাক্রান্ত ললাটদেশ,
স্পন্দনকম্পিত অবয়ব হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া
অলক্ষিতে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনেক চিন্তার
পর সৈন্যদিগকে পুনরায় ইলিয়াছের (আঃ) অনুসন্ধানার্থে
প্রেরণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন এবং তখনি তদু-
দ্দেশ্যে বহির্গত হইবার জন্য সৈন্য সামন্ত ও ঘাতকদিগকে আদেশ
করিলেন।

সেনাপতির আদেশ অনুসারে দ্বিপ্রহরের তপ্তরৌদ্র উপেক্ষা
করিয়া সৈন্য-সামন্ত ও ঘাতকদের তখনই যাত্রা করিতে হইল।
দ্বিপ্রহরের খরতর রৌদ্রে চারিদিক্ জনমানবশূন্য। সকলে
শ্রম অপনোদনমানসে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে। পক্ষিগণ পর্য্যন্ত
বৃক্ষশাখায় পক্ষমধ্যে চঞ্চু বিন্যস্ত করিয়া শান্তি লাভ করিতেছে।
কিন্তু বেচারা সৈনিকগণ চাকরীর, পেটের ও জীবনের দায়ে সেই
দিকে যেন সম্পূর্ণ উন্মনস্ক। তাঁহাদের যেন কষ্ট, কষ্ট বলিয়াই
বিবেচিত হইতেছে না! হায়! চাকরী, তোমার বালাই লইয়া
মরিবার সাধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইদানীং মানবগণ
চাকরীরই অধিক পক্ষপাতী! তাহারা যাহাতে টাকা পয়সা উৎপন্ন
হয় অথচ যথেষ্ট সম্মানও আছে, এরূপ ব্যবসায় বাণিজ্য ও স্বাধীন
জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর জন্যই সমধিক লালায়িত!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সৈনিক পুরুষগণ সর্ব্বোপরি প্রাণের দায়ে কষ্টকে যেন সুখ বলিয়া গণ্য করত ইলিয়াছের (আঃ) উদ্দেশ্যে পর্ব্বত-গুহা সকল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। স্পষ্ট দিবা-লোকে অধিকাংশ পর্ব্বতগুহাই সম্পূর্ণরূপে আলোকিত; কতকগুলি অর্দ্ধ আলোকিত। উভয়ের কোনটীতেই দিবাভাগে লুকাইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। সৈন্যগণ এখানে সেখানে অন্বে-ষণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল এবং ক্লান্তদেহে শ্রমাপনোদন মানসে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িল। এমন সময় ইলিয়াছের (আঃ) উপর ঈশ্বর-আদেশ অবতীর্ণ হইল। তিনি তদ্দ্বারা আদিষ্ট হইলেন,—"এখন তৈফুরের প্রেরিত সৈন্যদের সঙ্গে দর্শন দিয়া তাহার ছেলের আয়ুস্কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া জ্ঞাপন করুন এবং ইহাও জানাইয়া দিন যে, তাহার ছেলেকে জীবিত রাখিবার কিংবা আয়ু দান করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা জীবিতেশ্বরের নাই। যিনি বিশ্বকর্ত্তা—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাঁহার হস্তে ন্যস্ত, তিনি ভিন্ন জীবন দান করা অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি এমন কি মুহূর্ত্ত মধ্যে ধনীকে নির্ধন, জীবিতকে নির্জ্জীব এবং নির্জ্জীবকে জীবন দান করিতে পারেন। তাঁহার শক্তি অপরিসীম। যদি সন্তানের আরোগ্য কামনা কর, তবে তাঁহার রাতুল চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর।"

ইলিয়াছ (আঃ) এরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া খোদাওন্দ

করিমের নাম স্মরণ করত পর্ব্বত-গুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং তৈফুর-প্রেরিত সৈন্যদিগকে দর্শন দান করিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করত অদৃশ্য হইলেন। কাহারও কোন দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য কিছুমাত্র ইচ্ছা হইল না। তাঁহার সেই নূরাণি * মুখারবিন্দ, ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ-বিভাসিত চক্ষুর্দ্বয়, বচনের অমানুষিক তেজস্বিতা দর্শন করিয়া, তাহাদের প্রাণে বাস্তবিকই ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। সেই অভাবনীয় তেজোধারণে অক্ষম হইয়া কাহারও কাহারও এমন কি চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। ইলিয়াছ (আঃ) যখন অন্তর্হিত হইলেন, তখন সকলেই বিবেচনা করিতে লাগিল—হায়, যে শিকার আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতে পারি নাই, সেই শিকার হাতে পাইয়াও হারাইলাম! যাহা হউক, ইলিয়াছ (আঃ) এই স্থানের নিকটস্থ কোন পর্ব্বত-গুহায় লুকাইয়া আছেন; এই সংবাদ পাইলেও বাদশাহ তৈফুর অনেকটা সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া সকলেই বাদশাহকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বাদশাহ আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করত ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন "সৈন্যগণ, তোমাদের কার্য্যকুশলতা বলিতে আমি কিছুই দেখিতেছি না। যিনি আমার

* ঐশ্বরিক জ্যোতি সম্পন্ন।

অমঙ্গল-বার্ত্তা তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহার শির তখন স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করা কি তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই? হায়! আমি এতদিন এরূপ সৈন্যগণেরই বিচক্ষণতার গর্ব্ব করিতাম।" বাদশাহ তৈফুর ঈশ্বরের কার্য্য-কুশলতার নিকট মানবের কার্য্যকুশলতা কত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর, তাহা যেন কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। এমন কি তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না যে, ঈশ্বর যাঁহাকে রক্ষা করেন, তাঁহাকে মারিবার সাধ্য অপর কাহারও নাই।

এইরূপ ক্রোধান্ধ হইয়া বাদশাহ কতিপয় বিশেষ বিচক্ষণ জল্লাদকে তাঁহার প্রাণ হরণ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। তাহারা পর্ব্বতসন্নিধানে উপস্থিত হইবা মাত্র খোদাতালার পক্ষ হইতে গজবের * অগ্নি উৎপন্ন হইয়া তাহাদের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। এইরূপে বেচারা জল্লাদগণ অকালে কালকবলে পতিত হইল। কিন্তু বাদশাহ তাহাতেও স্বীয় চেষ্টায় ক্ষান্ত হইলেন না। আবার বহুতর জল্লাদ প্রেরণ করিলেন; তাহাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল।

বাদশাহ তৈফুর এই সংবাদ শ্রবণে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে স্বীয় দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। উর্ব্বরমস্তিষ্ক ব্যক্তির

* সংহারের, বিনাশের।

পক্ষে কোন কার্য্যসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না। তিনি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিলেন,—"আমার তওরাৎ ধর্ম্মবাদী জনৈক মন্ত্রী আছেন,তিনি তথায় গেলে অবশ্য ইলিয়াছ (আঃ) তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাহির হইবেন। সৈন্যগণকে পূর্ব্বেই তথায় এরূপ ভাবে লুক্কায়িত রাখিতে হইবে, যেন তিনি তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহাকে বধ করিতে পারে। বাদশাহ মনে মনে এরূপ সঙ্কল্প আঁটিয়া সৈন্যগণকে যথোচিত পরামর্শ দান করত পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে লুকাইয়া থাকিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রীকে একথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না। যখন বুঝিলেন সৈন্যগণ ইত্য-বসরে তথায় যাইয়া লুক্কায়িত হইয়াছে, তখন বাদশাহ তৈফুর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মন্ত্রিবর, এতদিন বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই ইলিয়াছের (আঃ) বিরুদ্ধা-চরণ করিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু এখন দেখিতেছি তৎ-প্রবর্ত্তিত ঈশ্বর-বাদ সম্পূর্ণ সত্য। তিনি যে বলেন ভব-কাণ্ডের একজন কাণ্ডারী আছেন, স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্বই সম্ভবপর নহে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়াই এখন প্রতীয়মান হইতেছে। আমি সেই মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট মহাত্মাকে অবমাননা করিয়া অনুতাপের অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছি ; আপনি তথায় যাইয়া তাঁহাকে আমার দরবারে লইয়া আসুন। আমি

তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে একান্ত উৎসুক বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন।"

রাজনীতি এত সাংঘাতিক বস্তু যে তাহার মর্ম্মোদ্ধার করা অনেক সময় নেহায়েত উর্ব্বরমস্তিষ্কের পক্ষেও অসম্ভব। বিশেষতঃ যখন লোক মিত্রের মত ব্যবহার দেখাইয়া শত্রুতা সাধনে প্রয়াসী হয়, তখন তাহাব হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া সুকঠিন। বাদশাহের এবম্বিধ প্রস্তাব শ্রবণে মন্ত্রা মনে করিলেন, অসৎ কার্য্যের জন্য একদিন না একদিন লোকের পরিতাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। বাদশাহেরও তাহাই হইয়াছে। সুতরাং তিনি হৃষ্টচিত্তে ইলিয়াছের (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করণোদ্দেশ্যে তথায় গমন করিলেন। ইলিয়াছের (আঃ) প্রতি সেই মুহূর্ত্তে দৈববাণী হইল,—"আপনি পর্ব্বত-গুহা হইতে বহিগত হইয়া মন্ত্রীর সহিত দেখা করুন। বাদশাহের বহুতর সৈন্য মন্ত্রীর অজ্ঞাতে চারিদিকে আপনাকে হত্যা করিবার জন্য লুক্কায়িত আছে বটে, কিন্তু তাহারা কিছুতেই আপনার প্রতি শত্রুতা আচরণ করিতে সক্ষম হইবে না।" দৈববাণী শ্রবণে তিনি পর্ব্বত-গুহা হইতে বহির্গত হইয়া মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এ দিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে তৈফুরের লুক্কায়িত সৈন্যগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। মন্ত্রী এতদ্দর্শনে চমকিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তবে

কি ইহার মধ্যেও বাদশাহের ষড়যন্ত্র আছে! যাহা হউক, তিনি কিংকর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম হইয়া ইলিয়াছকে (আঃ) বাদশাহের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রী নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি বাদশাহ শত্রুতা সাধন করিবার জন্যই ইলিয়াছকে (আঃ) ডাকাইয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কারণ খোদাতালা তাঁহার ভাববাদীকে কখনও মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে দিবেন না।

ইলিয়াছ (আঃ) এই কথাগুলি শ্রবণ মাত্র তাঁহার কার্য্য ধীরে ধীরে সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে ভাবিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। পথিমধ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে কে একজন স্বর্গীয় দূত ইলিয়াছের (আঃ) কাণে কাণে বলিয়া দিলেন,—"আপনি আর ইহাদের অনুসরণ করিবেন না। ইহারা আপনার প্রতি শত্রুতা সাধন করিবার জন্যই আপনাকে রাজ-দরবারে লইয়া যাইতেছে। বাদশাহের ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রতারণা ও প্রলোভনমূলক।" দেখিতে দেখিতে অসংখ্য প্রহরীর মধ্য হইতে ইলিয়াছ (আঃ) কোথায় অদৃশ্য হইলেন, কেহই দেখিতে পাইল না। ঐশ্বরিক শক্তির কি অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব! প্রেরিত পুরুষের কি অভাবনীয় কার্য্য-কৌশল!

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বিফল মনে ফিরিয়া আসিতেছেন,

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এমন সময় দেখিতে পাইলেন, বাদশাহের একমাত্র পুত্রের শবদেহ সকলে শোকাকুল হৃদয়ে সমাধিস্থলে লইয়া যাইতেছে। বাদশাহ পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া কাঁদিয়া বক্ষঃ ভাসাইতেছেন। জগতে যাহার সহিত রক্তের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার মৃত্যুতে শোকাকুল হওয়া স্বাভাবিক। সাধারণতঃ সংসারীর পক্ষে পুত্র-কন্যার মৃত্যুর মত শোক আর বুঝি কিছুতেই হয় না। বাদশাহ তৈফুর ঘোর সংসারী। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি হৃদয়ে বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত কিছুকাল ইলিয়াছ (আঃ) সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন না।

বিশেষ প্রিয়পাত্রের মৃত্যু হইলেও দু'দিন, দশদিন যাইতে যাইতে লোকজন সেই শোক, সেই ব্যথা, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও কতেক পরিমাণে ভুলিয়া যায়। বিশেষ কোন কারণে মৃত ব্যক্তির কথা মাঝে মাঝে স্মরণপথে উদিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তখন শোকের মাত্রা অনেকটা লঘু হইয়া আসে। আগে যাহার নামে অস্থিপঞ্জর ধসিয়া যাইত—হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্থান-ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইত—দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু অলক্ষিতে চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িত, পরে তাহার নামে একটু হা হুতাশ হয় মাত্র। যদি মৃত ব্যক্তির কথা লোকজন কস্মিন্ কালেও ভুলিতে না পারিত, তাহা হইলে উদাসীনতার এক

প্রবল বন্যা সংঘটিত হইয়া কোন্ কালে জগৎকে ভাসাইয়া দিত! বাদশাহের শোকাকুল হৃদয়ের মধ্যেও জাগতিক প্রথা অনুসারে কিছুদিন অন্তে আস্তে আস্তে সুখের ঢেউ খেলিতে লাগিল। বাদশাহ কতেক পরিমাণে শোকমুক্ত হইয়া আবার ইলিয়াছের (আঃ) প্রতি শত্রুতা সাধন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। কথায় বলে,—"অমৃতের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলেও নিম কোন কালেই সুস্বাদু হয় না। আর কয়লাকে শতবার শত পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিলেও তাহার মলিনত্ব দূরীভূত হয় না।" যিনি চিরকাল খলতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন—যাঁহার চরিত্র একান্ত নীচ—যিনি ঈশ্বর-ভয়-বিরহিত—স্ত্রীর কুমন্ত্রণা যাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল—তাঁহার নিকট দয়া, সৌজন্য, ধর্ম্মভাব কিংবা সদ্ব্যবহার প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং ইলিয়াছ (আঃ) যে তদ্‌গুণসম্পন্ন বাদশাহ তৈফুরের বিরক্তি-ভাজন হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি কিসে ইলিয়াছকে (আঃ) হত্যা করিতে পারিবেন, তদর্থে নূতন নূতন কুমন্ত্রণা আঁটিতে লাগিলেন।

প্রেরিত পুরুষও তৎকালে চিন্তা-শূন্য ছিলেন না। কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকজনকে সৎপথে আনয়ন করা যাইবে. তিনি দিবা রাত্র কেবল ইহাই ভাবিতেন। চিন্তায় চিন্তায় না খাওয়া দাওয়ার প্রতি লক্ষ্য ছিল, —না শরীরের প্রতি

যত্ন ছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ঈশ্বর ভাববাদী করিয়া আমাকে জগতে পাঠাইয়াছিলেন ; আর আমি সেই ভাববাদীর কোন কার্য্যই করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের ভাববাদ আমার অযোগ্যতাহেতু কিংবা কার্য্য-কুশলতার অভাবে আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। আমার পরিতাপ রাখিবার স্থান কোথায় ? ত্রিদিবের অফুরন্ত অক্ষয় ভাণ্ডার মাথায় করিয়া বিনামূল্যে দান করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইলাম কিন্তু কৈ কেহ ত একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না! বুঝিয়াছি, জগতের হিসাবে বিনামূল্যে যে জিনিষ বিতরিত হয়, তাহার কোন কালে কাহারও নিকট আদর হয় না। কিন্তু আফ্‌-সোসের বিষয়, আমি যে অপার্থিব ধন নিয়া আসিয়াছিলাম, জগতের জিনিষের সহিত তাহার যে কোন তুলনা বা বিচার হয় না, এ কথা একটী প্রাণীও বুঝিতে পারিল না! ঈশ্বর যাহাদের মুক্তির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহারা বুঝিবেই বা কি করিয়া ? লহ্‌মাফুজ বিধানের * সময় বিপথগামী বলিয়া যাহা-দের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা সৎপথে আসিবেই বা কি করিয়া ? এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না।

* বিধি-লিপি নির্ব্বাচনের।

পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তবে নিরর্থক ভাববাদী প্রেরণের উদ্দেশ্য কি?

হৃদয়ের মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল তর্কের বন্যা প্রবাহিত হইয়া ইলিয়াছকে (আঃ) আজ একান্ত বিহ্বল করিয়া তুলিল। যাহারা চিরকাল শত্রুতা আচরণ করিলেও ইলিয়াছ (আঃ) মিত্রতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—পদে পদে যাহাদের সম্মুখে স্বকীয় অপার্থিব উদার কার্য্যকলাপ দ্বারা মহানুভবতার এক সম্মোহন ও মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস পাইতেন—জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যাহাদিগকে এতকাল স্বর্গের পথে আহ্বান করিয়া আসিয়াছেন—আজ যেন তাহাদিগকে অভিশাপ দিবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রকৃত পক্ষে এই অভিশাপ, অভিশাপ আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারে না। কারণ ইহা জাগতিক স্বার্থ, পরশ্রী-কাতরতা ও মনঃকষ্টের সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিরহিত। ইহাকে বিধর্ম্মিগণের ধর্ম্ম গ্রহণ হেতু বিধাতার কিংবা তন্নির্দ্দিষ্ট প্রেরিত পুরুষের শাসন আখ্যায় আখ্যাত করা যাইতে পারে।

ইলিয়াছের (আঃ) এতদিনের যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইতে বসিয়াছে দেখিয়া তিনি আজ সকরুণ স্বরে খোদার দরগায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে খোদা, তুমি সর্ব্বশক্তিমান, তুমি ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পার। পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া

নগরের প্রতিষ্ঠা করা, এবং নগরকে গহন কাননে পরিণত করা, তোমার পক্ষে সময়সাপেক্ষ নহে। নিরীশ্বরবাদীকে ঈশ্বরবাদে আনয়ন করা তোমার পক্ষে একান্ত সহজসাধ্য। তবে কিনা প্রথমে পৌত্তলিকতা হইতে তাহাদের মন উঠাইতে হইবে। যদি সম্ভবপর হয়, তবে সাত বৎসরব্যাপী সিরিয়ায় দুর্ভিক্ষ ও জল-কষ্ট হউক, ইতিমধ্যে বাদশাহ রাজ্য পালনে অক্ষম হইয়া "জীবিতেশ্বরের" নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যখন জানিতে পারিবে, তাহার ঈশ্বরের কার্য্য-কলাপের উপর কোন ক্ষমতা নাই, তখন তাহারা বাধ্য হইয়া তোমার রাতুল চরণে লুটাইয়া পড়িবে।" ইলিয়াছের (আঃ) প্রার্থনা শেষ হইলে দৈববাণী হইল,—"হে ইলিয়াছ, সাত বৎসর ব্যাপিয়া দুর্ভিক্ষ ও জল-কষ্ট হইলে আমার সাধের সৃষ্টি ছারখার হইয়া যাইবে! সৃষ্টি নাশ করিয়া জগতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। সুতরাং তিন বৎসরের জন্য দুর্ভিক্ষ ও জল কষ্ট হইলেই যথেষ্ট হইবে।"

ইলিয়াছের (আঃ) প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে, দেখিতে দেখিতে চারিদিকে বিষম দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের সঞ্চার হইল। বাদশাহ কিছুতেই দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট বারণ করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিলেন। অবশেষে জীবিতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হইল ; তাহাতেও কিছু ফলোদয় হইল না।

এতদ্দর্শনে বাদশাহ ইলিয়াছের (আঃ) প্রতি শত্রুতা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি ভুলিয়া, নিজের চিন্তায়ই একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। লোকের যখন সুখ সমৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, তখন অপরের প্রতি শত্রুতা চরিতার্থ করিতে কিংবা সম্ভব হইলে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কেহ কেহ দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু যখন নিজের চিন্তায়ই দিনরাত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তখন অপরের প্রতি শত্রুতা চরিতার্থ করিবার ভাবনা অন্তরে জাগরূক থাকিলেও, কার্য্যতঃ যেন হইয়া উঠে না।

ইলিয়াছ (আঃ) যখন দেখিলেন তদুপরি বাদশাহের রাগ কারণপরম্পরায় কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে, তখন আত্মগোপন করিয়া পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকের দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টজনিত আর্ত্তনাদে তাঁহার উদার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া উঠিল। তিনি পর্ব্বত-গুহা হইতে বহির্গত হইয়া লোকের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এই গৃহে সেই গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যখন যেই গৃহে যাইয়া তিনি উপস্থিত হইতেন, তখনই তাহাদের অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট দূরীভূত হইত। কে যেন তাহাদের অজ্ঞাতসারে যথোচিত জল ও খাদ্যদ্রব্য গৃহে আনিয়া রাখিয়া যাইত। অভাবে সাহায্য-দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি মানবহৃদয় মাত্রেই স্থান

পাইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা প্রত্যক্ষভাবে এ সমস্ত অলৌকিক কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই বাদশাহের ভয়ে বাহ্যিকভাবে না হইলেও আন্তরিক ভাবে ইলিয়াছকে (আঃ) ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিল।

ইলিয়াছ (আঃ) তৎকালে সিরিয়ার যে স্থানে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে তওরাৎ-প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, তথায় নিসায়া নামক জনৈক যুবক বহুদিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। নিসায়ার মাতা পয়গাম্বরের এইরূপ অলৌকিক কার্য্যকলাপের কথা শ্রবণ করত একদিন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া, বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"আপনি ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ, আপনি দয়াপরবশ হইয়া ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই আমার পুত্রের প্রাণদান হইতে পারে। আমি আপনার পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নিসায়া আরোগ্য লাভ করিলে, আমি যাবজ্জীবন তাহাকে আপনার ফরমাহ্ বরদার * করিয়া দিব।" হায়! সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার কি অপূর্ব্ব স্নেহ! সন্তানকে জীবিত দেখিয়া মাতাপিতার মরিতেও যেন সুখ হয়!

* আজ্ঞাবহ।

ইলিয়াছ (আঃ) তদর্থে প্রার্থনা করিলে নিসায়া সেই মুহূর্ত্তেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন এবং মাতার উপদেশ অনুযায়ী প্রেরিত পুরুষের অনুসরণ করিলেন। 'এদিকে এ সমস্ত অলৌকিক কাহিনী বাদশাহ তৈফুরের কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রেরিত পুরুষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এ অবস্থায়ও নিসায়া কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। নিসায়া-সমভিব্যাহারে পয়গাম্বর যখন তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বাদশাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এই অন্ন ও জলকষ্ট দূর করিতে পারেন কি না ?" তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "কেন, আপনার অধিষ্ঠিত ও একমাত্র উপাস্য জীবিতেশ্বরকে এ বিষয় সাহায্য করিতে অনুরোধ করুন। তিনি কতবার আপনাদের কত মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছেন ; এ সামান্য সাহায্য কি তাঁহার দ্বারা হইবে না ?"

"মনে করুন তিনি যেন পারেন না। আপনার এতদ্বিষয়ে কোন ক্ষমতা আছে কি না, তাহাই আমি জানিতে চাই।"

"জীবিতেশ্বর যদি ইহার কিছুই করিতে না পারেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাহার চেষ্টা দেখিব।"

"জীবিতেশ্বর যে কোন জবাব দিবেন না।"

"নিশ্চয়ই জবাব দিবেন। আপনি যাইয়া যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাদশাহ প্রতিমা-গৃহে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দেখিতে পাইলেন, জীবিতেশ্বর সজীব মানব-সদৃশ ভয়াকুল হৃদয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে অভিবাদন করত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"পয়গাম্বর আসা অবধি আমি আর স্ববশে থাকিতে পারিতেছি না। হয়ত এই মুহূর্ত্তেই ভূতলে পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইব। আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে অতি সত্বর জিজ্ঞাসা কর।" বাদশাহ ইলিয়াছ (আঃ) কথিত সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে তথাকথিত জীবিতেশ্বর বলিতে লাগিলেন,—"আমার এমন কোন ক্ষমতা নাই, যদ্দারা এই অন্ন ও জলকষ্ট হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারি। পরম কারুণিক পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ ব্যতীত এই কার্য্য সাধন অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।" এই বলিতে না বলিতে ক্ষণভঙ্গুর জীবিতেশ্বর ভূতলে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

প্রতিমাগৃহ হইতে বিষণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পয়-গাম্বরকে জানাইলেন যে, জীবিতেশ্বরের এ কার্য্যসাধনের কিছু-মাত্র ক্ষমতা নাই। লোকজনের জীবনরক্ষা হেতু আপনিই তাহার উপায় দেখুন। পয়গাম্বর বুঝিলেন হয়ত এরূপ সাহায্য প্রাপ্তিতে বাদশাহের অন্তঃকরণ ভগবৎ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, হয়ত তিনি সাকার উপাসনার ক্ষণিক শান্তির বিনিময়ে,

নিরাকারের চির-পীযুষ-প্লাবিত শান্তিধারায় মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিবেন। এরূপ মনে করিয়া পয়গাম্বর হাত তুলিয়া মোনাজাত করিতেই সম্পূর্ণ পৃথিবী পূর্ব্বাকার ধারণ করিল। কিন্তু ইহাতেও পয়গাম্বরের প্রতি বাদশাহের কিছুমাত্র ভক্তির সঞ্চার হইল না। পয়গাম্বর সমস্ত করিয়া সারিলে, তিনি তাঁহাকে ভোজবাজীতে সিদ্ধহস্ত বলিয়া মনে করিলেন।

এই ঘটনার পরে পয়গাম্বরের পক্ষে নিরীশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকদের মধ্যে বসবাস করা যেন অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্বীয় কার্য্যের আজীবনব্যাপী অকৃতকার্য্যতা হেতু তিনি একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। দু'দশ দিন কিংবা দু'চার বৎসরের অকৃত-কার্য্যতাজনিত মনস্তাপ অবশ্য কতকটা সহ্য করা যায় কিন্তু জীবন ব্যাপিয়া অকৃতকার্য্যতা-জনিত মর্ম্মান্তিক বেদনা সহ্য করা দূরে থাকুক, ধারণা করিতেও কষ্টকর মনে হয়। ইলিয়াছ (আঃ) মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়াই এতটা সহ্য করিতে পারিয়া-ছিলেন। কিন্তু যৌবনে সর্ব্ববিষয় যতটা সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে, বৃদ্ধ বয়সে যেন ততটা হইয়া উঠে না। এই হেতু বৃদ্ধ বয়সে এতটা মর্ম্মবেদনা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া, নিসায়াকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় সেই বিজন পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে সেদিকে ইতস্ততঃ পদবিক্ষেপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন

করত মনে শান্তি আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইলেন। যাঁহার অন্তরে সুখ নাই প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদ তাঁহাকে সুখ দিবে কি করিয়া ? জগতের শত সহস্র শোভা-সৌন্দর্য্য কিছুতেই তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইল না। তাঁহার মন যেন জগচ্চক্ষুর অন্তর্ধান হইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তিনি একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ও উদাসচিত্তে ধীরে ধীরে পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিতে লাগিলেন। নিসায়া তাঁহাকে বিষণ্ণ ও বিচলিত অনুভব করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পর্ব্বতশিরে উপনীত হওয়া মাত্র দেখিতে পাইলেন, একটী সজ্জিত অশ্ব তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তিনি অশ্ব-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নিসায়াকে স্বীয় গাত্রস্থিত "জুব্বা" * উপহার দিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা, অদ্য হইতে বানি-ইস্রায়েল বংশকে হেদায়েত করিবার জন্য তুমিই পয়গাম্বর হইলে। আমার জন্য কিছুমাত্র আফ্‌সোস করিও না। আমার একমাত্র সন্তান, তোমার পীর ভ্রাতার † ধর্ম্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। আমার অবশ্য মৃত্যু নাই, কিন্তু লোকালয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমি লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, আবশ্যক হইলে, তোমাকে সাহায্য করিতেও ত্রুটী করিব না। আর

* গাত্রাবরণ বস্ত্র বিশেষ, চাপ্‌কান।

† দীক্ষাগুরুর পুত্রের।

বিশেষ কি বলিব, আশীর্ব্বাদ করি তুমি যেন তাহাদিগকে হেদায়েত * করিতে সক্ষম হও।" এই বলিয়া ইলিয়াছ (আঃ) অশ্বারোহণে অদৃশ্য হইলেন। কথিত আছে, বানি-ইস্রায়েল বংশের শোচনীয় পরিণাম দর্শন করণার্থে আজও তিনি জীবিত আছেন!

নিসায়া (আঃ) বহু চেষ্টা করিয়াও বানি-ইস্রায়েল বংশকে সৎপথে আনয়ন করিতে পারিলেন না। তিনি যখন পরলোক-গত হইলেন, তখন আল্লাহ্ বানি-ইস্রায়েল বংশের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া সাতশত বৎসর পর্য্যন্ত জগতে আর কোন ভাববাদী প্রেরণ করেন নাই। পৌত্তলিকতার চতুর্দ্দিকময় একাধিপত্য ও পয়গাম্বর-হীন কতিপয় শতাব্দী সুলতান জমজমার শাসনকালের অন্তর্ভুক্ত।

* ধর্ম্মপথে আনয়ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

-০:::*:::০—

যে রাজ্যের নিরীশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতাই একমাত্র অবলম্বন—যেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই—সেখানে যিনি ক্ষমতা, বলবীর্য্য ও বীরদর্পে বড় হইবেন, তাঁহারই পদতলে যে সিংহাসন লুটিয়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং কালে কালে সিরিয়ার সিংহাসন হস্ত হইতে হস্তান্তর লাভ করিয়া অবশেষে ইলিয়াছের (আঃ) পুত্র-বংশ-জাত জমজমা নামক প্রবল পরাক্রমশালী মহা যোদ্ধারই হস্তগত হইল। খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারক হজরত ঈসা (আঃ) জগতে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমান কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কথিত সোলতান জমজমা সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তৎকালে সিরিয়ার প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য, কৃত্রিম কারুকার্য্য-সমূহ ও রাজপ্রাসাদরাজির বিচিত্রতা, জগতে অতুলনীয় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তৎকালীন প্রত্যক্ষদর্শী পৌত্তলিক-

গণ সিরিয়াকে যেন বেহেশ্ত * বলিয়াই মনে করিত। তাহারা মনে করিত যদি বেহেশ্ত কথাটা কাল্পনিক না হয়—যদি বেহেশ্ত বলিতে বাস্তবিকই কোন সুখ-স্থান বিদ্যমান থাকে—তবে তাহা সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি সিরিয়ায় ব্যতীত আর কোথাও সম্ভবপর নহে! সিরিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপর পৃথিবীর তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাচার্য্যগণ যে সমুদয় নয়নাভিরাম অমরকীর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তৎসম্মুখে হীরা-পান্না-জওয়াহেরাত-ভূষিতা ও বসনসম্পদে অতুলনীয়া পরম রূপবতী রমণীও অকিঞ্চিৎকর ও অভোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত! সুতরাং ঈশ্বর-ভয়-বিরহিত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য তৎকালীন মূর্খ পৌত্তলিক-সম্প্রদায় সিরিয়ার শোভা-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, তাহাকে যে বেহেশ্ত বলিয়া গণ্য করিবে, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু হায়! এই বিপথগামী মূর্খগণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারে নাই যে এই শিল্পাচার্য্যেরও এক মহান্ শিল্পাচার্য্য বর্ত্তমান। এই সৌষ্ঠব যে সেই স্বর্গীয় সৌষ্ঠবের শতাংশের একাংশও নহে, ইহা যেন তাহাদের বুদ্ধিতে কিছুতেই ঘটিয়া উঠিল না। তাহাদের পাপময় জীবন-প্রবাহিনী কুসংস্কার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল!

ঈশ্বর-ভয়-বিবহিত সোলতান জমজমার সিংহাসন আরো-

* স্বর্গ।

হুণের পর হইতে সিরিয়া দিন দিন আরও ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুন্দরকে সৌন্দর্য্যে গরীয়সী করা সহজ-সাধ্য। কেননা বহুতর পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ নির্ম্মাণ যতটা কষ্টকর, খাটী সোনার উপর চাকচিক্যতা সম্পাদন করা, ততটা কষ্টকর নহে। সিরিয়া, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহগণ কর্ত্তৃকই কালে কালে সুন্দর হইতে সুন্দরতর স্তরে আনীত হইয়াছিল। জমজমার শাসনকালে তাহার সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকাশ হইয়া ষোলকলায় পরিণত হইল। জমজমা এই সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পদে সমাসীন হইয়া যখন স্বীয় ভুজবলে চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত রাজন্যবর্গকে তাঁহার বিপুল শক্তির সম্মুখে অবনতমস্তক করিয়া তুলিলেন, তখন তিনি নিশ্চিন্তে আরাম, বিলাসিতা, উপভোগ ও সৌখীনতার ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিলেন। লোকের যখন সুদিন আসে, তখন আরাম, বিলাসিতা, উপভোগ ও সৌখীনতার দিকে প্রায় সকলেরই একটু ঝোঁক দৃষ্ট হয়। তদুপরি নিরীশ্বরবাদও পৌত্তলিকতা যাহার একমাত্র অবলম্বন, তাহার পক্ষে ধরিত্রীই স্বর্গ-স্বরূপ। এই কল্পিত স্বর্গের যত কিছু আরাম-আয়েসের * উপকরণ আছে, তৎসমুদয়ের রসাস্বাদন করিতে সচেষ্ট হওয়া, তাহার পক্ষে যেন যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হয়। জগতের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আসক্তি, রুচিবিরুদ্ধ

* স্বাচ্ছন্দ্য।

কামনা ও সর্ব্বপ্রকারের ভোগলিপ্সা, তাহার অন্তরে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করা, যেন স্বাভাবিক হইয়া উঠে। অত্যাচার, লুণ্ঠন, পরদার-গমন, কৃতঘ্নতা, কিছুই তাহার নিকট পাপ বলিয়া বিবেচিত হয় না। যাহার মনে এই ধারণা আছে যে, জীবনান্তে আমাকে পরলোকে স্থানান্তরিত হইতে হইবে এবং তথায় যাবতীয় পাপ কর্ম্মের জন্য আমাকে ঈশ্বর-সমীপে দায়ী হইতে হইবে। আমি দৈনন্দিন যাহা করিতেছি তাহা ঈশ্বরের নিয়োজিত কেরামন-কাতেবিন * রীতিমত লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এই নিরপেক্ষ ফেরেশ্তা-দ্বয়ের লিখিত যাবতীয় পাপ-কর্ম্মের জন্য আমাকে যথোচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তিনি যেমন পাপ-কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইবেন; ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, ঈশ্বর-ভয়-বিরহিত নিরীশ্বরবাদীর অন্তরে সেরূপ সঙ্কোচের আবির্ভাব হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

জমজমা ঈশ্বর-আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যদিও পাপের মাত্রা দিন দিন বাড়াইতেছিলেন, তথাপি তাঁহার অন্তরে মুহূর্ত্তের জন্যও সঙ্কোচ কিংবা ভীতির আবির্ভাব হইল না। পাপ করিতে করিতে বিবেক যখন কু-প্রবৃত্তির নিকট মুখ তুলিয়া কথা বলিতে সাহস পায় না, তখন বিবেক বেচারী নীরব থাকাই সঙ্গত বিবেচনা করে। মানবের দেহ ও কু-প্রবৃত্তি যখন একমত হইয়া

* পাপ পুণ্য লিপিবদ্ধ করিবার ফেরেশ্তাদ্বয়। কথিত আছে মানবের জীবিতাবস্থায় ইঁহারা অদৃশ্যভাবে দুইজন দুই স্কন্ধে থাকিয়া পাপপুণ্য লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস পায়, তখন বিবেক একা একটী প্রাণী, পরাজিত না হইয়াই পারে না। মহা যোদ্ধাকেও যেমন সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে একযোগে দুইটী শত্রু আক্রমণ করিলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, পরাজয় স্বীকারে অস্ত্র ত্যাগ করিতে হয়, বিবেক বেচারীর ভাগ্যেও এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়া থাকে। যৌবনপ্রারম্ভে যখন মানবের পঞ্চেন্দ্রিয় দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে, তখন পাপ-পুণ্যের সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া যুবক কোন্ পথ গ্রহণ করিবে, প্রথমে এই ভাবনাই তাহাকে উদাসীন করিয়া তুলে। বিষ-কুম্ভ-পয়োমুখ পাপকর্ম্ম, কামনা-বসন-ভূষণে পরিশোভিত হইয়া, যখন তৎসম্মুখে মনোরম ক্ষণিক স্বর্গশোভা প্রদর্শন করে, তখন সুযোগ্য মন্ত্রিপরিচালিত অবিচলিত ও বিচক্ষণ রাজ্যপতি না হইলে, হৃদয়-রাজ্যকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা, সম্ভবপর হইয়া উঠে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌবনের সহিত সম্ভোগ-লিপ্সার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং অনুকরণপরবশ মানব-হৃদয়ের সাধারণতঃই যে এদিকে একটু টান থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। যেদিন মানব এই আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া কাম, লোভ ও মোহের ঘূর্ণ্যমান স্রোতমধ্যে গা ঢালিয়া দেয়, সেইদিন হইতে মনুষ্যত্ব তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়ায়—সেইদিন হইতে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাহা হইতে অপসারিত হয়—সেদিন হইতে চরিত্র বলিতে তাহার

আর কিছুই থাকে না। মানব-জীবনে অলক্ষিত ভাবেও যদি এই কলঙ্ক একবার প্রবেশ করে, তবে শত চেষ্টায়ও তাহার সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। এ কলঙ্ক ধীরে ধীরে চরিত্রের মজ্জাগত হইয়া উঠে। তখন শত ধৌত করিলেও এই কলঙ্ক-কালিমা হৃদয় হইতে অপসারিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তদুপরি অসৎ-সংসর্গ ইহার এক বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। যদি কোন প্রকারে ভুলেও একবার জীবনে কু-চরিত্রের বীজ বপন করা হয়, আর তাহাতে রীতিমত কুসংসর্গ-জনিত জল সেচন চলিতে থাকে, তবে তাহাতে যে বিষবৃক্ষের আবির্ভাব হয়, অনুতাপের শত কুঠারাঘাতেও তাহাকে ভূতল-শায়ী করা সম্ভবপর নহে।

জমজমার জীবনাভিনয়ের যৌবনাঙ্কেই এই কুচরিত্র ও কুসংসর্গের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কৌশলি কুসংসর্গের যত্ন ও চেষ্টায় ও স্বীয় কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায়, তিনি ভোগ-লিপ্সায় এরূপ আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, জীবনে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয় নাই। কুকার্য্য করিতে করিতে যখন অনুতাপের সঞ্চার হয়, তখন ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর-ভীতিকে আত্মচালনের নেতৃত্বে বরণ করিলে, কুপ্রবৃত্তি ধীরে ধীরে নিরাকৃত হইয়া উঠে। ইহাও দেখা যায় যে, ধার্ম্মিক পিতার পুত্র-কন্যা পাপে লিপ্ত হইলে,

পাপ করিতে করিতে যখন তাহা নীরস ও ক্ষণ-সুখপ্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন হঠাৎ সমস্ত ত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিক হইয়া বসে। বয়সের আধিক্য হেতু শক্তি-সামর্থ্যহীন হইয়াও, কাহাকেও কাহাকেও সুপথে আসিতে দেখা যায়। কিন্তু জমজমার জীবনে এরূপ কোন সুযোগই সংঘটিত হইল না!

যে দিন জমজমার উপর সুরাদেবীর কৃপা-কটাক্ষ পতিত হইয়াছিল, সেদিন কোথা হইতে অলক্ষিতে এক প্রবল বন্যা আসিয়া তাঁহার চরিত্র-নদীর স্বচ্ছ বারিরাশিকে কলুষিত করিয়া ফেলিল। বিবেকরূপ মনোমাঝি অনেক চেষ্টা করিয়াও এই আবর্ত্তমধ্যে নিজের নৌকা বাঁচাইতে পারিল না। একে জমজমার জীবন-সমুদ্রে ফাল্গুনের উত্তাল তরঙ্গমালা তরঙ্গের উপর তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া নিজ মনে বহিয়া যাইতেছিল, তদুপরি যখন হঠাৎ বন্যার সৃষ্টি হইল, তখন বেচারী মাঝি ভগ্নোৎসাহ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল! নৌকা সহ মাঝি সেই চরিত্র-নদীর কলুষিত জলমধ্যে জীবনের মত নিমজ্জিত হইল! হৃদয় হইতে বিবেকের অন্তর্ধানে পাপ-প্রশ্রয় উন্মত্ত জমজমার হৃদয়ে কিছুমাত্র পরিতাপ দৃষ্ট হইল না! বল্গা-উন্মুক্ত দুর্দ্দান্ত অশ্ব যেরূপ এদিক্ সেদিক্ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, সোলতান জমজমারও তাহাই হইল। তিনি প্রতিনিয়ত পাপ হইতে ভীষণতর

পাপে লিপ্ত হইতে লাগিলেন। তথাপিও তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন হইতেছিল না। সুরার আনুষঙ্গিক নর্ত্তকী, বারাঙ্গনা ও পরদার-গমনে তিনি সিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অশন, বসন, শয়ন ও উপভোগ ভিন্ন তাঁহার জীবনের যেন অপর কোন কর্ত্তব্যই ছিল না। কথিত আছে চারিশতবর্ষ আয়ুস্কালের মধ্যে অধিকাংশ সময় তিনি কেবল ভোগ-লিপ্সায়ই লিপ্ত ছিলেন ; সুতরাং তিনি কতটা ভোগ-লিপ্সার চরমে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয় !

তাঁহার সৎকার্য্যের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, তিনি দানের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যহ হাজার দিনার * করিয়া দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন। এতদুপরি প্রত্যহ এক সহস্র বিবস্ত্রকে বস্ত্র ও এক সহস্র ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিতেন। এই মহানুভবতার সঙ্গে যদি চরিত্র-বল ও ঈশ্বর-ভক্তি জম-জমার জীবনকে স্বর্গীয় বিমল স্নিগ্ধালোকে উদ্ভাসিত করিত, তবে আজ বহুকাল পরেও তাঁহার পূর্ব্ব জীবন মানব-সমাজের পক্ষে কত শিক্ষাপ্রদ হইত !

* মুদ্রা বিশেষ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, রোগ-যন্ত্রণার পর স্বাস্থ্য লাভ, জীবনের পর মৃত্যু, ইহাই জগতের রীতি। ফলতঃ সুখের সময় সুখ যেমন বে-মালুম আসিয়া পড়ে, সুখের অন্তে দুঃখও তেমনি অলক্ষিত ভাবেই আসিয়া উপস্থিত হয়। আজন্ম নির-বচ্ছিন্ন সুখ কিংবা দুঃখ কাহারও ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। তজ্জন্যই দুঃখের পর সুখ এতটা মিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর অবকাশ তজ্জন্যই এতটা প্রীতিপ্রদ। পক্ষান্তরে সুখের পর দুঃখ, অবকাশের পর হাড়ভাঙ্গা খাটুনিও তদ্রূপ তিক্ত. নীরস ও অনভীপ্সিত। মানবের ভাগ্যা-কাশের সুখ-সূর্য্য যখন ক্লান্তকলেবরে অস্তোন্মুখ হইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়ে, তখন তাহার যাবতীয় সুখ-স্বপ্ন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে চৌদিকের ঘন আঁধারে ঘিরিয়া ফেলে! অতীতের আলোক

তাহার আর তখন কোন কাজে আসে না! আঁধারের মধ্যেই তাহার জীবনের সেই বিষাদময় অঙ্কের অভিনয় সমাধা হইয়া থাকে।

জমজমার জীবনও প্রভাত হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সুখ-সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া, অবশেষে আঁধারে ঘিরিয়া আসিতে লাগিল। দিন দিন শরীরের শক্তি সামর্থ্য লোপ পাইয়া, শেষে হৃদয়-পিঞ্জরস্থ 'মন-ময়না' যেন উড়ো উড়ো করিতে লাগিল। আর যেন তাহাকে সহস্র চেষ্টায়ও ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না। হঠাৎ একদিন তাঁহার ঠাণ্ডা লাগিয়া বুক পিঠ ধরিয়া বসিল। অকস্মাৎ রোগের আক্রমণে তিনি নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বহুদিন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও দুঃখী অবশ্য তাঁহার জীবনে নিরাশ হয় না, কিন্তু চিরসুখীর এক মাত্র রোগের আবির্ভাবেই জীবন-প্রদীপ নিবিয়া যাইবে বলিয়া ধারণা হয়। সে ধারণা নেহায়েত অমূলকও নহে। যিনি দুঃখে চিরকাল অভ্যস্ত তাঁহার যে কিছুকাল দুঃখ ভোগ সহ্য হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজীবন সুখের পর যাঁহার একবার মাত্র দুঃখ আসিয়া দেখা দেয়, তাঁহার সেই দুঃখই কাল হইয়া থাকে। আর দুঃখই যাঁহার অবলম্বন—যিনি দুঃখের পসরা শিরে ধারণ করিয়া জগতে নিরাশ্রয়ের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—যিনি স্বকীয় ও পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য রাত দিন খাটিয়া খাটিয়া

ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইতেছেন—যাঁহার জগতে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবার স্থান নাই, তাঁহাদের ত এরূপ মৃত্যু বড় একটা দেখা যায় না! তাঁহারা যদি সকালেই মরিয়া যাইবেন, তবে তাঁহাদের দুঃখ ভোগ করিবে কে?

আমাদের কথিত জমজমার জীবন শেষোক্ত প্রকারের নহে। সুতরাং এই সামান্য অসুখেই যে তাঁহার জীবন-প্রদীপ চিরকালের জন্য নিবিয়া যাইবে, তাহা স্থির নিশ্চয়। সোলতানের রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তৎকালীন বিখ্যাত রাজ-চিকিৎসকগণ সতত শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া অসংখ্য বহুমূল্য ঔষধ প্রয়োগেও তাঁহার পীড়ার কিছুমাত্র শান্তি করিতে পারিলেন না। পীড়ার চতুর্থ দিবসে কথা বলিবার শক্তি লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মউতের ছখ্‌তি * আসিয়া দেখা দিল। তিনি যেন শরীরময় শত বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিতে লাগিলেন! এত জ্বালা-যন্ত্রণা, এত কষ্ট, এত প্রাণস্পর্শী নির্য্যাতনেও প্রাণ যেন বাহির হইতে চাহিতেছিল না! এক একবারের ঊর্দ্ধশ্বাস প্রাণের রক্ত শীতল করিয়া দিবার শত চেষ্টা করিয়াও, যেন কৃতকার্য্য হইতেছিল না! এ অসীম বেদনা মুখে ব্যক্ত করত কিঞ্চিৎ দুঃখের লাঘব করাও যে তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না! আল্লাহ্ যে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত করিয়া

---

* যমযাতনা।

দিয়াছিলেন! এই দুঃসহ বেদনায় জমজমার দুই চক্ষু বহিয়া দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার রোগ-জীর্ণ শুষ্ক বদন-কমল, কর্ণদ্বয় ও শিয়রোপাধান অভিষিক্ত করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আঁধার হইয়া আসিতে লাগিল! মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠিল! চেতনাশক্তি রহিত হইবার উপক্রম হইল!

এত নির্য্যাতন ও কষ্টভোগ করা সত্ত্বেও "প্রাণ-বিহঙ্গ" যেন তাহার ভালবাসার দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অন্যত্র উড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না। সে যেন বলিতেছিল—"আমি আমার বহুদিনের ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া নিরাশ্রয় পথের ফকির সাজিয়া, কোথায় যাইব? কে আমাকে আদর ও যত্ন করিবে? যদিই বা আমি চলিয়া যাই কিংবা যাইবার জন্য আমাকে কেহ বাধ্য করে, তবে আমার চিরকালের অভিন্নহৃদয় বন্ধু দেহ-পিঞ্জরের কি অবস্থা হইবে? আমি অবশ্য তাহার মধ্যে জীবনী-শক্তিরূপে বিরাজমান। আর সে আমাকে মনোহর গৃহমধ্যে বহুকাল সম্মানের সহিত রাখিয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দে লালন-পালন করিতেছে। প্রেমিক যেমন নিজের শত কষ্ট হইলেও প্রেমাস্পদের জন্য পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হয় না—সেও তদ্রূপ নিজে শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমার যাহাতে সুখ হয়, জীবন ভরিয়া সে চেষ্টাই দেখিয়াছে। আমি এই অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে

ছাড়িব কি করিয়া ? সে আমার জন্য জীবন ভরিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়াছে আর আমি কি না তাঁহার সামান্য চা'র দিনের অসুখেই হাল ছাড়িয়া দিতে বসিয়াছি ! আমি এরূপ করিলে আমার নেহায়েত নেমকহারামি প্রতিপন্ন হইবে। যতক্ষণ সাধ্য আছে, ততক্ষণ বন্ধুর স্থায়িত্ব-বিধান-কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিব। সাধ্যের অতীত হইলে আমি আর কি করিব ?"

"প্রাণ-বিহঙ্গ" তাহার সাধের দেহ-পিঞ্জরকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ দৃঢ়সংকল্প হইয়া বসিলে পর, কি এক অপার্থিব স্বর্গীয় আলোকে অকস্মাৎ গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল ! কোথা হইতে চারিজন স্বর্গীয় দূতের আবির্ভাব হইল। তাঁহাদের সকলকে বিষণ্ণবদন দর্শন করিয়া জমজমা প্রমাদ গণিতে লাগিল। তাঁহার কোটরগত হরিদ্বর্ণ চক্ষুর্দ্বয় আগন্তুকগণের মুখপানে ফেল্ ফেল্ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাঁহার বাক্‌শক্তিরহিত শুষ্ক বদনমণ্ডল হইতে আর যে বাক্যস্ফুরণ হইতেছিল না। তিনি যে আর রাজকীয় গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলেন না—"তোমরা কি চাও ?" তখন তাঁহার চক্ষুই যেন স্বরের কাজ করিল। প্রথম ফেরেশ্তা যেন ইশারা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার রুজির * মালীক ছিলাম। অন্য সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া খুঁজিয়া

* ভরণ-পোষণ, উপার্জ্জন।

সারা হইলাম, কিন্তু তোমার জন্য কোথাও কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না! তোমার রুজি জন্মের মত বন্ধ হইয়াছে! পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ সীমার মধ্যে তোমার জীবন রক্ষা হেতু অদ্য কোথাও একগ্রাস অন্ন খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং অনুমান হইতেছে তোমার সময় বড় সঙ্কীর্ণ। তুমি বোধ করি আর অধিকক্ষণ বাঁচিবে না। অতএব আমি এখন বিদায় হই।” তিনি তাঁহার কথা শেষ করিয়া বিদায় হইলে পর, দ্বিতীয় ফেরেস্তা বলিতে লাগিলেন—“তুমি জীবিতাবস্থায় যত জল পান করিবে, সেই জল সরবরাহের জন্য এতদিন আমিই নিযুক্ত ছিলাম। অদ্য তোমার পিপাসা শান্তি করিবার জন্য জলের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলাম, যেন পৃথিবীর সমস্ত জল শুকাইয়া গিয়াছে। দীঘি, পুষ্করিণী, খাল, ঝিল হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী—সপ্ত সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তোমার পিপাসা নিবারণের জন্য একবিন্দু জল খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং তোমার সময় অতি সঙ্কীর্ণ। তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।” তৎপরে তৃতীয় ফেরেস্তা বলিতে লাগিলেন—“আমি তোমার নিঃশ্বাসের খবরদারি করণার্থ নিযুক্ত ছিলাম। অদ্য কোথাও তোমার জন্য একটী নিঃশ্বাসও খুঁজিয়া পাইতেছি না। সুতরাং এখনই নিঃশ্বাস অভাবে তোমার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া যাইবে। তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।”

সর্ব্বশেষে চতুর্থ ফেরেস্তা বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার আয়ুস্কালের প্রহরী ছিলাম। অদ্য বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, তোমার আয়ুস্কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

জমজমা নিবিষ্ট-চিত্তে এ কথাগুলি শুনিতেছিলেন; আর এদিকে তাঁহার চক্ষু হইতে দরদর-ধারায় অশ্রু বহিয়া নীরবে কত কি বেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল! কিন্তু আপসোসের বিষয় তাঁহার পৌত্তলিক বন্ধু-বান্ধবগণ যে কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না! তাঁহার সেই মৃত্যু-বেদনাজনিত ঘন ঘন মুখ-ব্যাদান—তাঁহার সেই নীরব উহু! উহু!! রব—তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা নির্য্যাতিত ঘন মৃদু স্পন্দন—তাঁহার পিপাসিত কণ্ঠের নীরব জল চাওয়া, কেহ যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতে-ছিল না! চতুর্দ্দিক্ জুড়িয়া বন্ধু বান্ধব ও পরিজনবর্গ কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। কিন্তু কেহই তাঁহার মৃত্যু-যন্ত্রণার কিছুমাত্র শান্তি করিতে পারিতেছিল না। আহা! ব্যথার ব্যথী না হইলে সমবেদনা প্রকাশ করাত কিছুতেই কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে!

অকস্মাৎ জমজমার ঘন ঘন শ্বাস নিঃসরণ হইতে লাগিল। তাঁহার দেহের গ্লানি মুহূর্ত্তমধ্যে বাড়িয়া উঠিল। তিনি আবার চৌদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় কেরামন-

কাতেবিন তাঁহার পূতি গন্ধময় জঘন্য আমলনামা * আনিয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির করিলেন এবং উহা পড়িয়া দেখিবার জন্য নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। তিনি এদিক্ সেদিক্ মুখ ফিরাইতে লাগিলেন ; কিছুতেই সেই অসংখ্য পাপের কথা পড়িতে চাহিতেছিলেন না। এমন সময় একটী দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কে যেন কোন্ সুদূর রাজ্য হইতে কাহাকে আদেশ দিতেছেন— "এই মুহূর্ত্তেই পাপী জমজমার প্রাণহরণ করত দোজখে (নরকে) পৌঁছাইয়া দাও।" জমজমা এই আদেশ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন! দেখিতে দেখিতে আজরাইল (আঃ) তাঁহার প্রাণ-পাখী হরণ করিয়া শূন্যে প্রস্থান করিলেন! এতদিনে জমজমার ধূলার শরীর ধূলায় মিশিয়া গেল! এতদিনে তাঁহার বাহুবল ও গর্ব্ব সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালার এক ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গেল! এতদিনে তিনি যে শরীরের জন্য এত যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিতেন, তাঁহার সেই সাধের শরীর ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল! হায়! এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের কি শোচনীয় পরিণাম! পাপ-জীবনের কি গুরুতর শাস্তি!!

* পাপ-পুণ্যের হিসাব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—::•::•—

মানবের যখন মৃত্যু হয় তখন আজরাইল (আঃ) দুই প্রকারে মানবের আত্মাকে ঈশ্বর-সমীপে উপস্থিত করেন। যিনি পুণ্যবান্ তাঁহার রুহ্‌কে * আতর-গোলাব ও মোস্ক-জাফ্‌রাণ † সুগন্ধিত বেহেস্তি রজতশুভ্র বস্ত্রে জড়াইয়া, একান্ত আদর ও সম্মানের সহিত, ঈশ্বরসমীপে নিয়া উপস্থিত করেন। আজরাইল (আঃ) মোমেনদের ‡ এবম্বিধ রুহ্ হস্তে করিয়া আকাশ-পথে যাইবার সময় সুগন্ধে চারিদিক ভরপুর হইয়া উঠে। সপ্ততল আকাশের প্রত্যেক দ্বার তাহাদের সম্মানার্থে আপনা হইতেই খুলিয়া যায়। আকাশের প্রত্যেক স্তবকের ফেরেস্তাগণ আজরাইলের (আঃ) হস্তস্থিত সেই রুহ্ আচ্ছাদন-বস্ত্রের স্বর্গীয় সৌরভে মুগ্ধ ও উৎফুল্ল হইয়া "মারহাবা!

---

* আত্মাকে।

† বহুমূল্য সুগন্ধ-দ্রব্য বিশেষ।

‡ ধার্ম্মিকদের।

মারহাবা !!” রবে সেই মোমেন মৃতাত্মার উদ্দেশ্যে অযাচিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে থাকেন। এবং মোনাদি * করিয়া বলিতে থাকেন—“সৎকার্য্য করিয়া জগৎ হইতে পরলোকে ফিরিয়া আসিলে, খোদাতালা স্বীয় বন্ধুর প্রতি এইরূপ সদ্ব্যবহারই করিয়া থাকেন। আজরাইল (আঃ) খোদাতালার সন্নিধানে যখন সেই মহদাত্মাকে নিবেদন করেন, তখন স্বয়ং খোদাতালা সম্মানের সহিত তাঁহার বন্ধুকে অভিবাদন করিয়া ইল্লিন নামক স্বর্গে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করেন। পক্ষান্তরে কাফেরের † মৃত্যু হইলে পূতিগন্ধময় দোজখের অপরিস্কৃত কৃষ্ণ বস্ত্রে তাহার রুহ্‌কে জড়াইয়া, ঈশ্বর সমীপে লইয়া যাওয় হয়। পথিমধ্যে ফেরেস্তাগণ আজরাইলের (আঃ) হস্তে কাফেরদের দুর্গন্ধময় বস্ত্রাচ্ছাদিত জঘন্য ও পাপময় রুহ্‌ দর্শন করিয়া ধিক্কার (লাহানত) দিতে থাকেন। শেষোক্ত রুহ্‌ সমূহ খোদাতালার দরগাহে পৌছিবার পূর্ব্বেই দৈববাণী হয়—“ইহাদের রুহ্‌কে এদিকে আনিয়া কাজ নাই; ইহারা ইল্লিনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইহাদের রুহ্‌কে সপ্তস্তবক জমিনের ‡ নীচে অন্ধকারময় ছিজ্জিন ¶ নামক স্থানে, আজাবের § মধ্যে রাখিয়া আইস, ইহারা আজাব ভোগ করিতে

* ঘোষণা।
† বিধর্ম্মির।
‡ মৃত্তিকা।
¶ নরক বিশেষ।
§ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু নিয্যাতনের।

থাকুক। জমজমা শেষোক্ত প্রকারের লোক ছিলেন বলিয়া, রুহ্ আছমানে * পৌঁছিবা মাত্র দৈববাণী হইল—"ইহাকে ছিজ্জিনে নিয়া আজাব করিতে থাক।"

ঈশ্বর-আদেশ সেই মুহূর্ত্তেই প্রতিপালিত হইল। নরকের তত্ত্বাবধানকারী মালেক (আঃ) অগৌণে তাঁহার নরকবাসের বন্দোবস্ত করিলেন! বাদশাহ জমজমার কষ্টের অবধি রহিল না! অগ্নি! অগ্নি!! চতুর্দ্দিকময় অগ্নি!!! জমজমাকে ঘিরিয়া ফেলিল! তাঁহার জীবনের সুখ স্বপ্ন যেন এক মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল! তাঁহার অগ্নিনির্ম্মিত বসন-ভূষণ—অগ্নির মধ্যে বসবাস একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল! যিনি জীবনে কখনও মৃত্যুকামনা করেন নাই—যিনি মৃত্যুর নামে সতত শিহরিয়া উঠিতেন, আজ এই দুঃসহ কষ্টে পতিত হইয়া, সেই মৃত্যু হওয়াই তাঁহার নিকট কত ভাল বোধ হইতেছে! তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—"হে খোদা, তুমি আমার মৃত্যু আনয়ন কর, আমার এ জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হউক! আমি এই দুঃসহ যাতনা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি, তুমি—"আর্‌রাহ্‌মানের্‌রাহিম"; তুমি পাপীর পাপ ক্ষমা করিয়া থাক। অতএব এ বিপদ সময় দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আজাব হইতে মুক্তি দান কর! অথবা এই মুহূর্ত্তে ত্রিলোক হইতে আমার অস্তিত্ব লোপ

---

* আকাশে।

করিয়া দাও। অন্তরের নিভৃত স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরে শরীরে শিরায় শিরায়, কত কি জ্বালা যন্ত্রণা ও বেদনা অনুভব করিতেছি! মুহূর্ত্তের জন্যও আজাব হইতে যে আমার নিষ্কৃতি হইতেছে না! অহো! আর যে পারি না! অহো! আর যে সহ্য হইতেছে না! তোমার দয়া ভিন্ন আর যে উপায়ান্তর নাই!

জমজমার এরূপ কাকুতি মিনতির প্রতি স্বয়ং খোদাতা'লা কিংবা ফেরেশ্তাগণ কেহই কর্ণপাত করিতে ছিলেন না। পরন্তু দোজখের ফেরেশ্তাগণ যাহাতে তাঁহার আজাব আরও বৃদ্ধি পায়, সে চেষ্টাই দেখিতে ছিলেন। জমজমা বহু চিন্তা করিয়াও সেই অগ্নিময় গৃহ হইতে পলায়নের কিম্বা কোন প্রকারে আজাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার, উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইলেন না! হায়! মানবের বাহুবল ও বুদ্ধিবল সেই সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতা'লার নিকট কত সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর! তিনি নিরুপায় হইয়া প্রতিদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন কিন্তু খোদাতা'লা যেন তাঁহার সেই প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিতেছিলেন না। যিনি জীবনে কখনও খোদার নাম স্মরণ করেন নাই, তিনি আজ ঈদৃশ দুঃখে পড়িয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে খোদাকে স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার শত আর্ত্তনাদেও খোদাতা'লার দয়ালু হৃদয় আজ কিছুতেই দ্রবীভূত হইতেছিল না। মাঝে মাঝে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন আজাব একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত—যখন রক্ত-মাংসের শরীরে আর কিছুতেই মানিয়া উঠিত না—জমজমার তৎকালীন চীৎকারে সপ্ত নরক প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত হইয়া উঠিত! সেই বিভীষিকাময় আর্ত্তনাদ সপ্ততল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যখন পশু-পক্ষীর শ্রুতিগোচর হইত, তখন তাহারা ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে, প্রলয়কাল সমুপস্থিত জ্ঞানে কাঁপিয়া অস্থির হইত! * জগৎ-শরীরের উপর দিয়া যেন প্রলয়ের এক নৈরাশ্য বিজড়িত তপ্ত পবন তখন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িত: হায়, ঈশ্বর-আদেশ লঙ্ঘনের কি ভীষণ শাস্তি! বিফলে ব্যয়িত জীবনের কি শোচনীয় পরিণাম!!

এত কষ্ট ভোগ করিয়াও জমজমার দুঃখের দিন অবসান হইল না। তাঁহার এত কান্নাকাটি যেন কেহ শুনিতেছিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে জমজমার চক্ষের জল পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে! এখন কাঁদিতে হইলে চক্ষু ফাটিয়া রক্তস্রাব হয়! তথাপিও জমজমা ক্রন্দন হইতে নিরস্ত হইবার নহেন। কারণ ক্রন্দনই মুক্তির একমাত্র উপায়—পতিতের একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা। চক্ষুজল পরম কারুণিক খোদাতালা হইতে আরম্ভ করিয়া মানবের অন্তঃকরণে পর্য্যন্ত দয়ার উদ্রেক করে। "সেই

* কথিত আছে জেন-এন্‌ছান ব্যতীত অপর সকলেই গোয়াজাব সম্বন্ধে জানিতে পারে।

জন্যই তিনি এই দুঃসহ বেদনা ভোগ করিতে একান্ত অক্ষম হইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুনরায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে খোদা, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি সর্ব্বপালক, তুমি সর্ব্বরক্ষক; ভূলোকে, দ্যুলোকে, স্বর্গে, নরকে সর্ব্বত্রই তোমার শক্তি অপরিসীম। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, আমার উপর কত কি কষ্ট হইতেছে, তাহাও তোমার অজ্ঞাত নহে। আমি না হয় সীমাবদ্ধ জীব বলিয়া সীমাবদ্ধ জ্ঞানে, তোমার বিরুদ্ধাচরণ ও পাপানুষ্ঠান করিয়াছি; কিন্তু তুমি ত তোমার সৃষ্ট জীবের প্রতি শত্রুতাচরণ করিবার পাত্র নও। তুমি দয়ালু ও ক্ষমাশীল, আমার শাস্তির চূড়ান্ত হইয়াছে, আর আমার সহ্য হয় না! অতএব দয়াপরবশ হইয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করত আমাকে আজাব হইতে মুক্তি দান কর।" তাঁহার প্রার্থনা শেষ হইলে স্বর্গ হইতে দৈববাণী হইল—"তুমি সারা জীবন যে সমস্ত পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ এ সামান্য আজাব তজ্জন্য যথেষ্ট নহে; তুমি আরও কঠোর শাস্তি পাইবার উপযুক্ত। তুমি এখন গরজে পড়িয়া দিবারাত্র যে আমার নিকট রোদন করিতেছ, তাহার কোন মূল্য নাই। এরূপ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য, কাকুতি মিনতি করা, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।"

"এইরূপ অনুশোচনা, কাকুতি মিনতি ও অশ্রুপাতে এখন কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কারণ মৃত্যুর পর আর

কাহারও তওবা * গৃহীত হয় না। বিশেষতঃ তুমি জগতে থাকিয়া আমার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার কর নাই; যাহাতে সর্ব্বদা আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পার, দিবারাত্র সেই চেষ্টাই দেখিয়াছ; সুতরাং তোমার ন্যায় নিমকহারামের দুঃখ দেখিয়া আমার দয়ার উদ্রেক হওয়া, স্বাভাবিক ও সম্ভবপর নহে! পক্ষান্তরে তুমি যেমন শতশত সুন্দরী ভার্য্যা, মনোমোহিনী নর্ত্তকী, সাধের পান-পাত্র, অনিন্দ্যসুন্দরী বেশ্যা ও অতুলনীয় বিলাস-সামগ্রী লইয়া, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে, আমিও এখন তদ্রূপ তোমাকে ভুলিয়া থাকিব! তোমার যদি আমার প্রতি কিছুমাত্র মহব্বত † থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিতাম! তোমার কষ্ট দেখিয়া নীরব থাকা, আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর হইত না!"

এই দৈববাণীর পর হইতে জমজমার কষ্ট আরও বাড়িল। দৈনন্দিন তাঁহার উপর পূর্ব্ব হইতে শতগুণ যন্ত্রণাদায়ক বহুবিধ নব নব আজাব নাজেল ‡ হইতে লাগিল। তিনি যে আর কিছুতেই এই দুঃসহ বেদনা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না! একদিকে আগুনের ঘর, আগুনের জানালা, আগুনের পোষাক, আগুনের

* কৃত পাপ স্মরণার্থ অনুশোচনা।

† ঐকান্তিক ভালবাসা।

‡ অবতরণ।

জামা, আগুনের জুতা—চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া আগুন ; অন্যদিকে আবার সাপ বিচ্ছুর সঘন ও বিষময় দংশন, তাঁহার প্রাণ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিতেছিল! প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হইয়া আসিত, তাঁহার হৃদয়ে তখন এই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও এক অভিনব আশার আলোক খেলিয়া যাইত। তিনি মনে করিতেন এবার বুঝি প্রাণ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে ; এবার বুঝি সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিব।' কিন্তু তাহা যে হইত না, মর মর হইয়াও প্রাণে আবার চেতনার সঞ্চার হইত। আবার সেই জ্বালা-যন্ত্রণা, আবার সেই মর্ম্মান্তিক বেদনা, আবার সেই প্রাণস্পর্শী অগ্নি-দহন, তাঁহার জীবনকে বিষময় হইতে অধিকতর বিষময় করিয়া তুলিতে লাগিল।

এইরূপ দুঃখ-কষ্টে জমজমার প্রায় শতাব্দীকাল কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিছুতেই তাঁহার প্রতি খোদাতালার দয়ার উদ্রেক হইতেছিল না! একদিন এই দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতে অক্ষম হইয়া, জমজমা পুনরায় খোদার দরগায় কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখে ও করুণ আর্ত্তনাদে দোজখের নির্দ্দয়-হৃদয় ফেরেশ্তাগণ পর্য্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দৈববাণী হইল—"জমজমাকে আজাব হইতে মুক্তিদান কর। তাহার এরূপ করুণ আর্ত্তনাদ আমার আর সহ্য হইতেছে না। আমার দয়ালু হৃদয় কতকাল সৃষ্ট জীবের প্রতি নির্দ্দয় হইয়া থাকিবে ?

অপর কিছু না হউক, তাহার দানশীলতার জন্য, আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই আদেশ করিতেছি যে, সিরিয়ার রাজপথ দিয়া হজরত ঈসা (আঃ) যাইতেছেন, তোমরা জমজমার মাথার খুলীকে সে রাস্তায় রাখিয়া আইস, আমি তাহার মুক্তির উপায় করিতেছি।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—•:::*:::•—

হজরত ঈসা (আঃ), নবুওত হাছেল হইবার পর হইতে, বিধর্ম্মীদিগকে হেদায়েত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি বিধর্ম্মীদিগকে ঈশ্বরানুরক্ত করিবার জন্য কখনও কখনও মোজ্জেজা * প্রদর্শন করিতেন। তিনি আজীবন নিতান্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছিলেন। কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের অবমাননা হেতু কিরূপ আজাব ভোগ করিতেছে, তাহা মৃতব্যক্তির নিজ মুখে, বিধর্ম্মীদিগকে শুনাইবার জন্য, মহাম্মদ (রছুল করিম ছল্লে-ল্লাহ্ আলায়হে অছাল্লামের) ন্যায়, তিনিও, বহুতর মৃত ব্যক্তিকে সময় সময় জীবিত করিতেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে পুনরায় তাহাদের লোকান্তর ঘটিত। ফলে এই হইল, তিনি কোন মানবের অস্থি, কঙ্কাল কিংবা মাথার খুলী ইত্যাদি কোথাও পড়িয়া

---

* অলৌকিক কার্য্য।

থাকিতে দেখিলে, তাহাকে জীবিত না করিয়া ও কথাবার্ত্তা না বলিয়া, কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না।

একদিন সিরিয়ার রাজপথ বহিয়া পয়গাম্বর উন্মনস্ক চিত্তে গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেছেন; হঠাৎ সম্মুখে একটী মাথার খুলী পড়িয়া আছে দেখিয়া, সেই মহান্ ভাবুক-হৃদয় বিচলিত হইল। মানব দেহের এই শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন! অবশেষে সেই মৃত ব্যক্তির সুখ-দুঃখের সংবাদ অবগত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহাকে জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে, খোদার দরগাহে প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা করিবা মাত্র সেই মাথার খুলীটি পূর্ণ অবয়বে পরিণত হইয়া, অবিলম্বে তন্মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি, হজরত ঈসাকে (আঃ) সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তিনি কে ও বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছেন, ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলে, ঝমঝম কাঁদিয়া আকুল হইলেন! কিছুই বলিতে পারিলেন না! বহুদিনের দুঃখ কষ্টে তাঁহার বাক্যরোধ হইয়া আসিতেছিল। ঈসা (আঃ) তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত প্রথমে হৃদয়ের বহুদিন সঞ্চিত একটি দুঃখের বোঝা নামাইলেন। পরে দুঃখ-কষ্ট-বিজড়িত করুণ কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি হজরত

ইলিয়াছ নবির (আঃ) জনৈক অযোগ্য বংশধর—নাম সোলতান জমজমা। পঞ্চ শতাব্দী পূর্ব্বে আমি সিরিয়ার সিংহাসনে সমাসীন ছিলাম। আমার দোর্দ্দিণ্ড প্রতাপে একদিন সমস্ত জগত আমার অভাবনীয় পরাক্রম ও বিশ্ববিজয়ী ক্ষমতার সম্মুখে নত মস্তক হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্য মদমত্ত, জ্ঞানাভিমানী, রণ:কুশল ও জগজ্জয়ী সম্রাট রূপে পরিগণিত হইয়া, আমি সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ খোদাতোলাকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই হেতু আমি যত কষ্ট ভোগ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে, এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে! আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা হয় !!”

ঈসা (আঃ)। তোমার দুনিয়ার জাঁক জমকের কথা শুনিবার জন্য আমার বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। প্রথমে তাহাই বর্ণন করিয়া আমার ঔৎসুক্য অপনোদন কর।

জমজমা। আমি নিতান্ত সুপুরুষ ছিলাম। তৎকালে রূপ-গুণ ও বিদ্যা বুদ্ধিতে আমাকে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। কিন্তু হায়! এত সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে বস বাস করিয়াও আমি একেশ্বর বাদের বিরোধী ছিলাম। যেই দিন হইতে আমার সিংহাসন লাভ হইল—সেই দিন হইতে আমি ধীরে ধীরে ঈশ্বরে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িলাম—সে দিন হইতে সাংসারিক জাঁকজমক ও বিলাসিতার হস্তে আমি যেন আত্ম বিক্রয় করিয়া বসিলাম!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শাস্তি ও অবমাননার ভয়ে কেহই আমার সম্মুখে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন নীরস প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সাহস পাইত না। আমি স্বকীয় কুবুদ্ধি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, আপাত মনোরম পাপকেই নিজের পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করিলাম। পাপাভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থেরও অভাব ছিল না। কুবেরের ধন ভাণ্ডার সদৃশ আমার সেই অফুরন্ত ধন ভাণ্ডার পাপ কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। সুখ ও আরাম আয়েসের মধ্য দিয়াই আমার দিন গুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমার হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃখের স্থান সঙ্কুলান হইত না।

যখন আমি সিংহাসনে উপবেশন করিতাম তখন পঞ্চ সহস্র সশস্ত্র দেহ রক্ষি (Body guard) ও পঞ্চ সহস্র দণ্ডধর, দরবারের শোভা সংবর্দ্ধনার্থ, আমাকে বেষ্টন করিয়া, চতুর্দ্দিকে সশঙ্কিত চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিত। পঞ্চ শত রূপবান গায়ক ও পঞ্চ শত রূপবান বাদক মণ্ডলী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সজ্জিত ভাবে আমার আদেশ অপেক্ষায় কক্ষান্তরে অপেক্ষা করিত। রাজ-কার্য্য করিতে করিতে যখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম, তখন পান-পাত্রে অতৃপ্ত চুম্বন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে, চিত্ত বিনোদন হেতু গান-বাদ্যে রাজ দরবার আনন্দময় হইয়া উঠিত। হায়! আমার সেই চারি শতাব্দী সুখ ভোগের সহিত বিগত এক শতাব্দীর আজাবের তুলনা করিলে, হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম

হয়! প্রত্যহ রাত্রি সমাগমে খোস্ মহলে এক সহস্র রূপে মোহে অতুলনীয়া ষোড়শী যুবতী গায়ত্রীর কার্য্য করিত এবং এক সহস্র নওজোয়ান *নর্ত্তকী চিত্ত বিনোদনার্থে ব্যাপৃত থাকিত। বহু দিন অনভ্যাস হেতু আমার কথা বলিতে নেহায়েত কষ্ট বোধ হইতেছে। কিন্তু আপনি যখন জানিতে চাহিতেছেন ও আপনার দ্বারা যখন আমার উপকার সম্ভব, তখন আপনাকে না জানাইয়াও উপায়ান্তর নাই। আপনি আমার জীবনের অদ্ভুত কাহিনী সমূহ শ্রবণ করিলে কিছুতেই আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। রমণী-স্বভাব-সুলভ সুমধুর গান ও নৃত্যের সঙ্গে সুরাদেবীর একত্র সমাবেশ হইলে, যাহা যাহা সম্ভবপর তৎ সমস্ত আমার জীবনকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল! হায়! আমি যেন রূপের আরাধনা করিবার জন্যই জগতে গিয়াছিলাম, এবং আজীবন রূপের আরাধনা করিয়াই যেন ফিরিয়া আসিয়াছিলাম!"

"আমার শিকারের জাঁকজমকের কথা শ্রবণ করিলে আপনি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। যখন আমি হর্ষোৎফুল্ল মেজাজে শিকার করিতে বহির্গত হইতাম, তখন এক সহস্র শিকার-পটু সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য আমার অনুগমন করিত। চারি সহস্র

---

* পূর্ণ যুবতী।

কাবাপোষ * ও উষ্ণীষধারী সৈন্য নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সুশোভিত হইয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইত। পথিমধ্যে সকলের দেহ রক্ষা হেতু বন্দুক, তীর, বল্লম ও বর্শা হস্তে চারি সহস্র সৈন্য পশ্চাতে, চারি সহস্র দক্ষিণে, চারি সহস্র বামে ও চারি সহস্র সম্মুখে বিরাজ করিত। এতদ্ব্যতীত দশ সহস্র পোষা বাঘ ও দশ সহস্র কুকুর আমার সঙ্গে শিকারে গমন করিত। আমি সৈন্য সামন্ত সহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, জগত হইতে যেমন সৃষ্টি নাশ হইবার উপক্রম হইত, তদ্রূপ শিকারে বহির্গত হইলে যে স্থানে গমন করিতাম, তথাকার পশু পক্ষী ও হিংস্র জন্তু একেবারে বংশ সুদ্ধ লোপ পাইত। আমার ধন বল, সৈন্য-বল ও রণকুশলতার সম্মুখে তিষ্ঠিবার উপযোগী দণ্ডধর তৎকালে জগতের কোথাও বিদ্যমান ছিল না।"

জমজমা এরূপ বলিতে বলিতে কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতেছিলেন। সুখের সহিত হজরত ঈসার (আঃ) নির্ব্বন্ধাতিশয়ে দুঃখের তুলনা করিতে যাইয়া, তাঁহার বুকের উপর যেন পাষাণ চাপা পড়িল! তাঁহার হৃদয় যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তিনি আর স্ববশে থাকিতে পারিলেন না! তদীয় মাথার উপর অনন্ত আকাশ ও পদতলে অসীম ধরিত্রী যেন নিমেষ মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শতবার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে

---

* বর্ম্ম পরিহিত।

লাগিল। ইতিমধ্যে তিনি হঠাৎ ঘুরিয়া পড়িয়া জ্ঞান হারা হইলেন! ঈসা (আঃ) অনেক চেষ্টা করিয়া পুনরায় তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার করাইলেন। জমজমা প্রকৃতিস্থ হইলে ঈসা (আঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"আজরাইল (আঃ) কিরূপ ভীষণভাবে আপনার সহিত দর্শন দান করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু-সময় তিনি আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? মনকির-নকির (আঃ) প্রমুখ ফেরেশ্তাগণ আপনাকে কি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ও আপনি তাহার কি কি উত্তর দান করিয়াছিলেন? এবং তাহার ফলে কি হইল?

জম। "পীড়ার চতুর্থ দিবসে শক্তি সামর্থ্য লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আমার বাক্যরোধ হইল, সমস্ত শরীরময় মউতের ছখ্‌তি অনুভব করিতে লাগিলাম! শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পর্য্যন্ত আমার কষ্টকর বিবেচিত হইতে লাগিল! দেহস্থিত প্রত্যেক অণু পরমাণু যেন পরস্পর সম্বন্ধ বিরহিত হইয়া উঠিল! জীবনী শক্তি যেন ধমনী হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল! অন্তঃকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেহ যেন চূর্ণ বিচূর্ণ ও রেজা রেজা * হইয়া যাইতে লাগিল! এই দুঃখের কথা কাহাকেও জানাইবার মত শক্তি আমার তৎকালে বিদ্যমান ছিল না! আমি কেবল ঘন ঘন মুখ ব্যাদান করিয়া ও চক্ষু পাকাইয়া সকলকে

* খণ্ড খণ্ড।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমার দুঃখের কথা জানাইবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস পাইতে ছিলাম, কিন্তু সেই ইসারা-ইঙ্গিতের দুঃখ প্রকাশ ও ভাষা-হীন মনোবেদনা কেহই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না! আমার অনুভব হইতে-ছিল কেহ যেন আমার সমস্ত শরীরের শিরা একত্রে আকর্ষণ করিয়া পায়ের দিক হইতে মাথার দিকে টানিয়া আনিতেছিল! কিছুক্ষণ এই ভাবে অতীত হইলে, ধীরে ধীরে আমার কোমর পর্য্যন্ত শীতল হইয়া আসিল! এদিকে ভীষণ মুর্ত্তিতে আজরাইল (আঃ) আমার সম্মুখে হাজির হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল তাঁহার আকাশ হইতে ভূতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত গঠন ও জমকাল মুর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি চক্ষু বন্ধ করিতে ও মুখ লুকাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। যে দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলাম সেই দিকেই তাহার সেই ভীষণ মুর্ত্তি আমার নয়ন গোচর হইতে লাগিল। আমি প্রাণ হারাইবার ভয়ে ভীত হইলাম। তাঁহাকে দেখা অবধি আমার প্রাণ থরহরি কম্পিত হইতে লাগিল। হায়! আজরাইলের (আঃ) সেই অত্যাশ্চর্য্য ও ভীতি বিজড়িত গঠন প্রণালী এখনও আমার মনে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে! তাঁহার মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে বহুতর মুখ বিদ্যমান ছিল। তিনি আমার নীরব ইসারা-ইঙ্গিত যেন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিলেন। তাঁহার এত গুলি মুখ হইবার কারণ কি ও কোনটীর দ্বারা

কি কার্য্য সাধিত হয়, ইহা ভাবিবা মাত্র, তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি সম্মুখের মুখ দ্বারা জগতের যত মোমেন লোক আছে তাঁহাদের রুহ্ কবজ * করিয়া থাকি। তাহাতে সেই পুণ্যাত্মাগণের কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব হয় না। দক্ষিণের মুখ সমূহ প্রলয় কালে ফেরেশ্তাদের জান কবজ করিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। এই দুই দিকের মুখ গুলির মধ্যে আল্লাহ্ এরূপ রহ্‌মত রাখিয়া দিয়াছেন যে মুমুর্ষু মাত্রই তাহাতে ভীত হইবার বা কষ্ট অনুভব করিবার কিছুই নাই। পশ্চাতে আমার যে সমস্ত মুখ আছে তাহা তোমার মত পাপাত্মা-দের প্রাণ হরণ করিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। এই সমস্ত মুখের মধ্যে দয়া মায়ার লেশ নাই—আছে শুধু কষ্ট ও মর্ম্মান্তিক বেদনা!"

আজরাইলের (আঃ) কথা শেষ হইতে না হইতে তৎ পশ্চাৎস্থিত ফেরেশ্তাগণের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ায় আমি নিতান্ত ভীত হইলাম। তাঁহারা আগুনের নোকা, † আগুনের ছুরি, আগুনের তলওয়ার, আগুনের তীর, আগুনের বল্লম ও আগুনের খঞ্জর হস্তে আমাকে আক্রমণ করিলেন। সেই জ্বালা যন্ত্রণার কথা মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি এরূপ ভাষা

* প্রাণহরণ।
† উল্কা।

নাই! আমার মনে হইল সেই ভীষণ অগ্নির একটী কণিকা যদি কোন মতে ভূতলে পতিত হয়, তবে সমস্ত সৃষ্টির এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ধ্বংস সাধন হইবে। আমি এবম্বিধ কষ্টে পতিত হইয়া ফেরেশ্তাগণের নিকটে ইসারা-ইঙ্গিতে নানা প্রকার কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলাম। অন্তরের নীরব চীৎকারে চতুর্দ্দিক বিষাদিত হইয়া উঠিতে লাগিল! কিন্তু ফেরেশ্তাগণের অন্তরে ইহাতেও কিছুঁমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না! আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও স্ত্রী-পুত্র দিগকে, আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেই বাক্য-হীন ভাষায়, কত অনুরোধ করিলাম! কিন্তু তাহারা কিছুতেই আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ফেরেশ্তাদিগকে কি এক অভূত-পূর্ব্ব আন্তরিক ভাব বিনিময় দ্বারা বলিতে লাগিলাম—"ভাইগণ, আমার রাজ ভাণ্ডারে অর্থের অভাব নাই, তোমরা যদি অর্থের ভিখারী হও, তবে অর্থ গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তি দান কর। যদি রাজ-প্রাসাদ ও সুন্দরী স্ত্রীলোকের ভিখারী হও,তবে তাহাও গ্রহণ কর। আমি কপর্দ্দক হীন পথের ফকির হইব তথাপি আমাকে জীবন-ধনে বঞ্চিত করিও না।" কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, পরন্তু এরূপ প্রস্তাবে ক্রোধিত হইয়া আমার মুখে এক ভীষণ চপেটাঘাত করিল। তাহাতে আমার মুখের শক্তি-সামর্থ্য সেই মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইল।

আমি পুনরায় প্রস্তাব করিলাম—"আমার অনেক পুত্র পৌত্রাদি বর্ত্তমান আছে, আপনারা আমার জীবন দান করুণ আমি তাহাদিগকে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কোরবানি করিয়া দিব।" তাঁহারা শুধু এইমাত্র বলিলেন—"ঈশ্বর কাহারও কোন জিনিষের ভিখারী নন এবং উৎকোচ তাঁহার নিকট নিতান্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য জিনিষ!" পূর্ব্বেই বলিয়াছি চপেটাঘাতের সহিত আমার মুখ মণ্ডলের শক্তি লোপ পাইয়াছিল এবং তৎপূর্ব্ব হইতেই কোমর পর্য্যন্ত রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ফেরেশ্তা-দের পক্ষে প্রাণ হরণ করা সহজ সাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি শিরারূপ নিগড়ে আবদ্ধ প্রাণ পাখীকে বাহির করিবার জন্য, যখন সমস্ত শিরার গোড়া ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমার অনুমান হইতেছিল কোন জীবন্ত প্রাণীর চর্ম্ম দেহ-যষ্টী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেও বুঝি এতটা কষ্ট হয় না!

এইরূপ কষ্টের পর প্রাণ-পাখী যখন দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল, তখন আমার আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনবর্গ সকলে কাঁদিয়া অস্থির হইতে লাগিল। দেশময় আমার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হইলে চতুর্দ্দিক বিষাদে আচ্ছন্ন হইল! দরিদ্র, আতুর ও ভিক্ষাজীবিগণ যাহারা আমার দানে সুখ স্বচ্ছন্দ্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহারা আমার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইল! কিন্তু পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাগ্যাকাশ কি দুঃসহ

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মর্ম্ম বেদনারূপ জলদ জালে ছাইয়া ফেলিল ও আমি কি দুঃখে জীবন যাপন করিতে লাগিলাম, তাহা ভূলোকের: কেহই আর জানিতে পারিল না।

সকলে মদীয় মৃত দেহকে যথাসময় শোকাকুল চিত্তে সমাহিত করিলেন। এদিকে দোজখের পূতি গন্ধময় অপরিস্কৃত কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া আমার রুহ্‌কে আজরাইল (আঃ) আকাশের দিকে লইয়া গেলেন। তথায় পৌঁছা মাত্র দৈববাণী হইল—"ইহাকে এদিকে আনিয়া কাজ নাই। প্রথমে ইহাকে কবরে পৌঁছাইয়া দাও। তথাকার কার্য্য সমাধান্তে ইহাকে ছিজ্জিনে আবদ্ধ রাখিয়া আজাব করিতেহইবে।"

আমার রুহ্‌ কবরে পৌঁছা মাত্র তথায় রোমান নামক জনৈক ফেরেশ্তার আবির্ভাব হইল। আমি কবরের অন্ধকার অবস্থা দেখিয়াই নিতান্ত ভীত হইয়াছিলাম। তদুপরি হঠাৎ যখন কে এক অপরিচিত আসিয়া কবরের মধ্যে উপস্থিত হইল তখন বিপদের উপর বিপদ গণিতে লাগিলাম! শঙ্কার উপর শঙ্কা বাড়িতে লাগিল! তাহার সেই সুবিশাল মূর্ত্তি—রোষ কষায়িত সুবৃহৎ চক্ষুর্দ্বয়—দয়া মায়া বিবর্জ্জিত কঠোর আদেশ—আমার নিকট অভদ্রজনোচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছিল। কিন্তু করি কি, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার যে উপায়ান্তর ছিল না! যদিও জীবনে কখন কাহারও আদেশ পালন করিতে

হয় নাই, যদিও আদেশ পালন করা আমার অনভ্যস্ত ছিল, তথাপি ঠেকিয়া পড়ায় যেন এক মূহূর্ত্তে তাহা অভ্যস্ত হইয়া গেল। তিনি আমাকে একান্ত কঠোর বাক্যে জীবনের যাবতীয় পাপ পুণ্য লিখিয়া দিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু এক দান-শীলতা ভিন্ন লিখিয়া দিবার মত আমার ত আর কিছুই ছিলনা! সুতরাং কিসে তাহা হইতে বাঁচিতে পারি, সেই উপায়ই দেখিতে লাগিলাম; অবশেষে বিনীত বাক্যে বলিতে লাগিলাম—"লিখিবার উপযোগী কাগজ কলমত, এখানে কিছুই নাই, আমি কিসে লিখিয়া দিব? আমাকে দয়া পরবশ হইয়া এ বিষয় ক্ষমা করিলে হয় না?" এতচ্ছ্রবনে তিনি যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন এবং আমাকে পুনরায় আদেশ করিলেন—"তোমার কাফনের কাপড় হইতে এক টুকরা ছিড়িয়া কাগজ-রূপে ব্যবহার কর, তোমার অঙ্গুলির মধ্যে তর্জ্জনি কলমের কার্য্য করুক, মুখের থুথুকে কালী-রূপে ব্যবহার কর।" আমি তাহাই করিলাম এবং দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে বেশ সুন্দর লিখা হইতেছে। সুতরাং দানশীলতা জনিত পুণ্যের কথাগুলি চট্ চট্ লিখিয়া ফেলিলাম। অবশেষে পাপের কথাগুলি কিরূপে লিখিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। গোপন করিয়াও তাঁহার হাত হইতে সহজে যে রক্ষা পাইব, সে আশাত আমার আদৌ ছিল না। তথাপিও জানি না কেন যে ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত গোপন করিবার ইচ্ছা হইতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমি লিখা বন্ধ করিয়া কত কি ভাবিতেছি দেখিয়া তিনি যেন আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং কর্কশ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"হ্যারে নেমক হারাম, পাপ-কার্য্য করিবার সময় তোমার ত কখনও এতটা ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই। মনে করিয়াছিলে জীবন চিরস্থায়ী হইবে—মনে করিয়াছিলে ইহার কোন হিসাব নিকাশ দিতে হইবে না—মনে করিয়াছিলে আরাম আয়েস, স্ত্রী পুত্র ও বিলাসিতার মধ্যেই চিরকাল ডুবিয়া থাকিবে। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে মানবের সকল সুখ-স্বপ্ন যে এক মুহূর্ত্তে মিটাইয়া দিতে পারেন, সে কথা ভাবিয়া, জীবনে কখনও ত পাপ কার্য্য হইতে বিরত হও নাই। এখন লজ্জা করিলে কি হইবে? তোমার চারিশত বৎসর ব্যাপী জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে এক পলকের জন্যও লজ্জা বোধ হইল না, আর এখন কিনা দায়ে ঠেকিয়া তুমি লজ্জা অনুভব করিতেছ। দেখি কেমন না লিখিয়া পার?"

এই কথাগুলি ফুরাইতে না ফুরাইতে তিনি আমার উপর বিষম নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। একেই তাহার হাব ভাব দেখিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল—অন্তরাত্মা উড়ো উড়ো করিতেছিল—তদুপরি যখন নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন, তখন আমি চৈতন্য শূন্য হইয়া পড়িলাম। ক্ষণকাল পরে পুনরায় চেতনালাভ হইল। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া বিনীত ভাবে

বলিতে লাগিলাম—"আমাকে এই মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতন হইতে মুক্তি দান করুণ, আমি অকপটে সমস্তই লিখিয়া দিতেছি।" ক্ষণকালের জন্য আমাকে নির্য্যাতন হইতে মুক্তি দান করা হইল এবং অগৌণে আমি জীবনের সমস্ত পাপকথা লিপিবদ্ধ করিলাম। লিখা সমাধা হইলে তিনি সেই বস্ত্র খণ্ডকে কবচের মত ভাজ করিয়া সিল মোহর করিবার আদেশ দিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম—"কি বিপদ, আবার মোহর কোথায় পাইব ?" কিন্তু তাঁহার নিকট পুনরায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আমার আদৌ সাহস হইতেছিল না। তিনি আমাকে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"মোহর কোথায় পাইবে, তাহা আর ভাবিতে হইবে না, তোমার অঙ্গুলির নখে থু থু সংযুক্ত করিয়া মোহর কর, তাহাতেই এতদুপরি সুন্দর মোহর অঙ্কিত হইবে।" আমি তাহাই করিলাম। দেখিলাম—বেশ সুন্দর মোহর অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি সেই বস্ত্র খণ্ডকে কবচের মত ভাজ করিয়া আমার গলদেশে বাঁধিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মনে করিলাম—যাহা হউক অল্পতেই রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু একি! দু' চার মিনিট অতীত হইতে না হইতে কবরের চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বন্ধু বান্ধব-হীন সেই অন্ধকারময় কবরের মধ্যে ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমার প্রাণ নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া উঠিল! হায়, আমাকে এই বিপদ সময় অভয় দান করিবার মত বন্ধু আমার নিকটে তখন ত আর কেহই ছিলনা! আমি একা একটী প্রাণী, কবরের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিলাম! কিছুক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম, মৃত্তিকা ভেদ করিয়া কি যেন আমার কবরের দিকে দ্রুত গতিতে ছুটিয়া আসিতেছে! আমি ভাবি-বিপদ্ পাতের আশঙ্কায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম! এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বন্ধু-বান্ধব, মন্ত্রী, সভাসদ, রণকৌশল সেনাপতি ও স্ত্রীপুত্রগণকে উচ্চ হইতে উচ্চতর শব্দে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু কাহারও কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না! অবশেষে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াও সুফল লাভে বঞ্চিত হইলাম! কেহই আমাকে কিছু মাত্র সাহায্য করিতে আসিল না!

দেখিতে দেখিতে আমার সেই কপাট জানালাহীন মাটির গৃহ মধ্যে চারিদিক তোল পাড় করিয়া মাটি ভেদ করত মনকির নকির নামক ফেরেশ্তাদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের উগ্রমুর্ত্তি দেখিয়া মন প্রথমেই বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি তাঁহাদের মুখ-নিঃসৃত কর্কশ শব্দ শুনিয়া মনে করিলাম ইঁহারাও হয়ত আমাকে কষ্ট দিতে আসিয়াছেন; সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া নিতান্ত ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়ি-

লাম। নীরবতা ভঙ্গ কয়িয়া তাঁহারা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন —"তোমার খোদা কে?" আমি তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করত নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার মানসে উত্তর করিলাম— "আপনারাই আমার খোদা।" ঈদৃশ উত্তর শ্রবণ করিয়া তাঁহারা যেন তৈলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হস্তস্থিত অগ্নির মুদ্গর, অগ্নির বল্লম, অগ্নির অস্ত্রে আমার প্রতি নানাপ্রকার নির্য্যাতন ও নিষ্পেষণ আরম্ভ করিলেন। আমি "রক্ষা কর" "রক্ষা কর" বলিয়া কত কাকুতি মিনতি করিলাম; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দয়া মায়ার যেন একান্তই অভাব ছিল। সুতরাং তাঁহারা কেহই আমার কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করিলেন না। এতদ্ভিন্ন উপরোক্ত ফেরেশ্তাগণ আরও দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি তাহারও কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। ফলে তাঁহারা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কবরের মধ্যে কোথা হইতে একটি গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সেই গুপ্তপথ বহিয়া দোজখের অগ্নিশিখা আসিয়া আমাকে দাউ দাউ করিয়া জ্বালাইতে লাগিল।

এ দিকে মনকির-নকির অদৃশ্য হইলে কবরের চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকারাশি ক্রমশঃ খিঁচিয়া আসিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে আমাকে নিষ্পেষিত করিবার উপক্রম করিল। আমি ভয়ে ও মর্ম্মান্তিক বেদনায় চীৎকার করিতে লাগিলাম। কিন্তু এরূপ

বিকট চীৎকার ও সাহায্য প্রার্থনায় কেহই কর্ণপাত করিল না। ক্ষণকাল মধ্যে আমার দক্ষিণ ও বামের পঞ্জর-অস্থি ঘোর নিষ্পেষণে একত্র হইয়া আসিতে লাগিল। জীবন্ত অবস্থায় * এরূপ অমানুষিক অত্যাচার আমার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল! মৃত্তিকারাশি কোন মতেই আমাকে ছাড়িয়া দিতেছিল না। অবশেষে কি আশ্চর্য্য! মৃত্তিকা-শরীর হইতে হঠাৎ বাক্যস্ফুরণ হইল এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—"বিগত চারি শতাব্দী পর্য্যন্ত তুমি আমাকে পদভরে দলিত ও মথিত করিয়াছ, আমার উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে কখনও সঙ্কুচিত হও নাই। আমি তোমার পদভরে কম্পিত বিকম্পিত হইয়া যখনই খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি তখনই এই আদেশ হইয়াছে—"'কিছুকাল বিলম্ব কর, মৃত্যুর পরে তোমার উদরে আসিয়া যখন আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখন ইহার যথোচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করিও।"' অদ্য আমার সে সুযোগ মিলিয়াছে; তোমাকে সহজে ছাড়িব না।" তাঁহার কথার আনুষঙ্গিক নিষ্পেষণের সহিত আমার শরীরের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অস্থিই মট্ মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। হায়, আমার তৎকালীন সেই বিপদ-

---

* কথিত আছে মৃত দেহে রুহ্ সংযোগ করিয়া কবরের মধ্যে আজাবাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

পাতের কথা স্মরণ করিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে! বাক্ রোধ হইবার উপক্রম হয়!!

ঈসা (আঃ) এই দুঃসহ বেদনার কথা শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। তাঁহার পর-দুঃখ-কাতর হৃদয় মধ্যে সহানুভূতির সঞ্চার হইল। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তৎপরে তোমার কি অবস্থা হইল।" তৎপরে কবরের মধ্যে কোথা হইতে এক বিকট মূর্ত্তি ফেরেশ্তার আবির্ভাব হইল। তাহার প্রতি লোমকূপ হইতে সূচের মত সুতীক্ষ্ণ লোম গজাইয়া তাহার সমস্ত শরীরকে সজারু হইতেও কুৎসিত ও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। আমি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে?" তিনি উত্তর করিলেন—"তোমার কুকার্য্য (বদ্আমল) হইতেই আমার উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং আমি আজীবন তোমার সঙ্গে বসবাস করিব।" তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি আমাকে বিশেষরূপে জড়াইয়া ধরিলেন। কিছুতেই তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম না। ফলে সমস্ত শরীরময় সূচ বিদ্ধ হইয়া যম-যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। এক দিকে বিষম অগ্নিদাহ অপরদিকে এই দুঃসহ বেদনা পলে পলে আমার জীবনকে কণ্ঠাগত করিয়া আনিতেছিল! কিন্তু পোড়া প্রাণ কিছুতেই বাহির হইতেছিল না!!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এমন সময় দুইজন কুৎসিত ও বিকট আকার ফেরেস্তা আসিয়া আমাকে গেরেপ্তার করত আকাশ-পানে লইয়া চলিল। আমি বুঝিলাম, এবার হয়ত দুঃখের বোঝা নামাইব—এবার হয় ত এই দুঃসহ বেদনা হইতে মুক্তি লাভ করিব। ফেরেস্তাগণ অতিশয় দ্রুত গতিতে আমাকে খোদাতালার খাস রহমতের ঠাঁই শান্তি নিকেতন আরশ মোবারকের* নীচে নিয়া উপস্থিত করিল। তথায় পৌঁছিবা মাত্র দেখিতে পাইলাম,—দুগ্ধ-ফেন-নিভ ও স্বর্ণ জওয়াহেরাত্‍† বিমণ্ডিত কেদারায় চারিজন মহাপুরুষ সমাসীন আছেন। ধৃতকারী ফেরেস্তাগণ সেই মহাপুরুষদের পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া আমাকে বাধিত করিলেন। তাঁহাদের নিকট জানিতে পারিলাম—প্রথম চেয়ারে যিনি সমাসীন তিনি সত্য প্রেমিক সেই হজরত ইব্রাহিম খলিল (আঃ), যাঁহাকে তৎকালীন কাফের বাদশাহ অগ্নিতে ফেলিয়াও ঈশ্বর-পথ হইতে বিচলিত ও ক্ষান্ত করিতে সক্ষম হন নাই। দ্বিতীয় চেয়ারে যিনি সমাসীন ছিলেন, তিনি হজরত মুছা কালিমুল্লাহ্, যাঁহার সহিত তুর (সিনাই) পর্ব্বতে স্বয়ং আল্লাহতালা নানাবিধ কথোপকথন করিতেন। তৃতীয় চেয়ারে যিনি সমাসীন ছিলেন তিনি ভাবী পয়গাম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোস্তফা ছল্লেল্লাহু আলায়হে

---

* ঈশ্বরের মহান্ সিংহাসনের।

† বহুমূল্য ধাতু বিশেষ।

অছালাম, যিনি খাতেমন্নবীন*—সমস্ত ধর্ম্ম হইতে যাঁহার ধর্ম্ম অত্যুৎকৃষ্ট—সমস্ত কেতাব মন্সুক † হইলে যাঁহার উপর "কোরআন" রূপ ঈশ্বর-বাণী অবতীর্ণ হইবে—যিনি শুধু পাপীদের সাফায়তের‡ জন্যই জগতে পদার্পন করিবেন। চতুর্থ চেয়ারে যিনি সমাসীন ছিলেন, তিনি ফেরেস্তা মালেক (আঃ)। শুনিতে পাইলাম ইনিই দোজখ বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী। কথায় বলে—"ঘর পোড়া গরু সিন্দুরে-মেঘ দেখিলেই ভয় পায়।" সুতরাং আমাকে যথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে, তথায় দোজখ বিভাগের বড় কর্ম্মচারী উপবিষ্ট আছেন শুনিয়া আমার শরীর আবার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছি, এমন সময় আরশ্-মহল্লা হইতে দৈববাণী হইল—"ইহাকে সত্বর দোজখে নিয়া কয়েদ কর।" এই কঠোর আদেশ শ্রবণ মাত্র আমার চেতনা লোপ পাইল! আমি কাষ্ঠপুত্তলিকা প্রায় নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ফেরেস্তা মালেক (আঃ) দৈববাণী শ্রবনে আমার প্রতি যে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিলেন,

* সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর।

† অমনোনীত, বাতেল।

‡ মুক্তির।

তাহাতে আমার প্রাণ-পাখী ভয়ে উড়ো উড়ো করিতে লাগিল! কিন্তু কিছুতেই কৃত-কার্য্য হইল না।

আমি চেতনা শূন্য অবস্থায় নির্ণিমেষ নেত্রে মালেকের (আঃ) প্রতি তাকাইয়া আছি, এমন সময় তিনি বজ্রনাদে আদেশ করিলেন—"দোজখের প্রহরিগণ, তোমরা অবিলম্বে ইহাকে গুরুভার অগ্নি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত দোজখে পৌঁছাইয়া দাও।" আদেশ হওয়া মাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। ফেরেশ্তাগণ আমাকে অগ্নি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত অপরাধীর ন্যায় নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে করিতে ভূতলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। জলের মধ্যে কোন গুরুভার জিনিস যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে ডুবিয়া যায়, তদ্রূপ মহিমাময়ের বিচিত্র মহিমায় গুরুভার অগ্নি শৃঙ্খল যেন মৃত্তিকা পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া, আমাকে তলাইয়া ফেলিতে লাগিল! আমি এরূপে সত্তর গজ মৃত্তিকার নিম্নে যাইয়া পৌঁছিলাম। তথায় পৌঁছিবা মাত্র দেখিতে পাইলাম ঠিক ঠাক দোজখের দরজায় আসিয়া পড়িয়াছি! এতদ্দর্শনে আমার মুখ শুকাইয়া গেল। অস্থি পঞ্জর ধসিয়া যাইতে লাগিল!! দেখিতে পাইলাম যে জাহান্নামের দরওয়াজা উপরে লেখা আছে—"এখানে প্রবিষ্ট হইলে কস্মিন কালেও আর বাহির হইতে পাইবেনা।" জীবনে আর কোন দিন যে মুক্তি লাভ হইবে, একথা কয়টী আমার হৃদয় হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ নৈরাশ্যের আবির্ভাবে যাবতীয়

দুঃখ কষ্ট দ্বিগুণ ও দুঃসহ হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ দোজখের দরওয়াজা উন্মুক্ত হইল। দোজখের সেই লেলিহান অগ্নিশিখা আমাকে তাহার বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল! আমি আবার কত কি দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে লাগিলাম!!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চৈত্র মাস। আকাশ মেঘ-মুক্ত। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে যেন চতুর্দ্দিক খাঁ খাঁ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। কৃষকগণ পর্য্যন্ত আতপ-তাপে ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে! হাটে, ঘাটে, মাঠে, গোঠে কোথায়ও জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। এমন কি পশু পক্ষিগণও ক্লান্তি অপনোদন মানসে তরুতল ও তরু শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সিরিয়ার রাজ পথে একটী প্রাণীরও যাতায়াত পরিলক্ষিত হইতেছে না। মধ্যাহ্ন কালীন সেই নীরবতার মধ্যে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ যেন চতুর্দ্দিকে স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। হজরত ঈসা (আঃ) সিরিয়ার রাজপথে এই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া তন্ময় চিত্তে জমজমার কাহিনী শুনিতেছিলেন। তাঁহার সুকোমল দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া তদীয় পরিহিত বসন-ভূষণ অভিসিক্ত করিতে লাগিল। তিনি সূর্য্য তেজোধারণে

অক্ষম হইয়া জমজমাকে বলিলেন—"এস, কোন সুশীতল বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন করিয়া তোমার সমস্ত কথাই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিব।"

জমজমা বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন করিয়া যখন কথঞ্চিৎ ক্লান্তি অপনোদন হইল, তখন ঈসা (আঃ) জমজমাকে দোজখের বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন।

জম। দোজখের দীর্ঘতা, গভীরত্ব ও বিস্তৃতির অনুমান করা সুকঠিন। এক সর্ব্ব শক্তিমান খোদাতালা ভিন্ন ইহার দীর্ঘতা, গভীরত্ব ও বিস্তৃতি অপর কাহারও জানা আছে কিনা সন্দেহ। এই সুবিস্তীর্ণ দোজখ-কারাগারের সাতটী দরওয়াজা আছে। সেই সপ্ত দরওয়াজার নাম যথাক্রমে ছাইর, লাজি, ছাকার, জাহিম, জাহান্নাম, হাবিয়া ও হোতামা। উপরোক্ত প্রত্যেক দোজখেই পাপীদের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম ও উর্দ্ধ-অধঃ বেষ্টন করিয়া সতত অগ্নিরাশি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। উহু! সেই দুঃসহ বেদনা রক্ত মাংসের শরীর ধারণকারীর পক্ষে একান্ত অসহ্য। তথায় কোথাও একটু প্রসন্নতা পরিলক্ষিত হওয়া অসম্ভব। সেখানে খাওয়া-দাওয়া, আরাম-আয়েস কিছুই নাই! থাকার মধ্যে আছে—দুঃখ কষ্ট ও মর্ম্মান্তিক বেদনা! দোজখিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া দোজখের কর্ম্মচারিবৃন্দ পর্য্যন্ত সকলেই

প্রফুল্লতা বিবর্জ্জিত। সেখানে ছায়া পাইবার ও শীতল হইবার আশা করা এবং মরুভূমে জল চাওয়া, উভয়ই সমান।

পাপিগণ দোজখের মধ্যে জ্বলিয়া পুড়িয়া কয়লার মত বিবর্ণ হইয়া আছে। তথায় "হায়! হায়!!" "গেলাম, ম'লাম" এই ভিন্ন অপর কোন কথা শ্রুতি গোচর হয় না। সেখানে কাহারও অনুতাপ জনিত তওবা গৃহাত হয় না। সেখান পাপী দের এক বীভৎস জ্বালাময় কারাগার! সেখানে সকাল সন্ধ্যা কেবল এইমাত্র শুনিতে পাওয়া যায়—"হে পাপিগণ, তোমাদের অগ্নি ভিন্ন খাওয়া দাওয়ার অপর কোন জিনিস নাই। খাওয়া দাওয়ার আবশ্যক হইলে, অগ্নির দ্বারাই উদর পূরণ কর। তোমা-দিগকে দোজখের জ্বালানি কাষ্ঠে পরিণত করা হইয়াছে। তোমরা আবহমান কাল দোজখে জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য করিবে।" এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া হৃদয়োপরি যেন সকল সময় পাষাণ চাপা পড়িত। আজীবনের জন্য কারাবাসে দণ্ডিত হইলে মানব যেমন পার্থিব সুখে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়ে, আমারও তাহাই হইল।

কিছুকাল পরে ছায়ার জন্য অনেক ক্রন্দন করার পর আমাকে এক বৃক্ষ তলায় স্থানান্তরিত করা হইল। বুঝিয়া-ছিলাম সেই বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় কিছুকাল আরামে থাকিতে পাইব। কিন্তু হইল কি—

"সুখ দুঃখ দু'টি ভাই,
সুখের আশায় যে জন ফুকারে—
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।"

দেখিলাম—সে যে এক আগুনের বৃক্ষ, তাহার পত্র সমূহ-আগুনের তৈয়ারি, তাহার বল্কল আগুনের কণ্টকে সমাচ্ছাদিত। দিন রাত্রি সকল সময় সেখানে আগুনের হাওয়া বহিয়া পাপী-দিগকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছে। তথায় পৌঁছিবামাত্র ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আসিতেছিল। আমি ক্ষুন্নিবৃত্তি করণ-উদ্দেশ্যে কিছু খাইতে চাহিলাম। ফেরেস্তারা আমাকে সেই গাছের একটী ছোট ডাল কাটিয়া খাইতে দিল। ক্ষুধায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া আমি অতি কষ্টে তাহাই খাইতে লাগিলাম। গলাধঃকরণ করিবার সময় কণ্ঠ মধ্যে কাটাগুলি এরূপভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, নীচের দিকে নামাইয়া দিবার কিম্বা উদ্গার করিয়া ফেলিবার কোন উপায় ছিল না। আমি বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। অবশেষে কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক ফেরেস্তাদের নিকট কিছু জল চাহিলাম। তাঁহারা অবিলম্বে আমাকে জাহান্নাম হইতে গরম পানি আনিয়া দিলেন। আমি সেই পানি উদরস্থ করিলে আমার প্রতি লোমকূপে, শিরায় শিরায়, মাংস ও অস্থির মধ্যে যেন বিষম আগুন জ্বলিতে

লাগিল। আমি এই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে অক্ষম হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। নিমেষ মধ্যে জলদ নির্ঘোষ সম কঠোর ও গম্ভীর নীনাদে আমার হৃদয় মধ্যে কে যেন পুনরায় চমক-চেতনা ঢালিয়া দিল! আমার পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর পুনরায় অগ্নি সংযোগে জ্বলিতে লাগিল! সর্ব্বোপরি পদতলের যন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল! আমি পদতল আচ্ছাদিত করিবার মত ফেরেশ্তাগণের নিকট কোন জিনিসের প্রার্থনা করিলাম। ফলে তাঁহারা জাহান্নাম হইতে আগুনের জুতা আনিয়া আমাকে পরাইয়া দিল। পুনরায় যন্ত্রণায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইবার উপক্রম হইল!

আমি এই দুর্ব্বিষহ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে কাকুতি মিনতি করিয়া কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতে লাগিলাম। তাহাতে খোদাতালার কিম্বা ফেরেশ্তাগণের অন্তরে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না, পরন্তু ফেরেশ্তাগণ আমার দুঃখের মাত্রা দ্বিগুণ করিবার উদ্দেশ্যেই যেন আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কম্‌বখ্‌ত, * কু-কার্য্য ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসের প্রতিফল এরূপই হইয়া থাকে। আজাব ভোগ করা ভিন্ন তো'দের উপায়ান্তর নাই। যাহারা সর্ব্বদা কু-কার্য্যে প্রবৃত্ত—ঈশ্বরকে কিছুমাত্র ভয় করে না—যাহারা আজাবের

* হতভাগ্য।

ভয়ে ভীত হইয়া কিম্বা ঈশ্বর প্রাপ্তি হেতু তাহার এবাদতে *
উন্মনস্ক—যাহারা ঈশ্বর-দত্ত শত নেয়ামত † খাইয়াও তাহার
শোকর গোজারি ‡ হইতে বিরত—যাহারা ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও
স্বীয় বিষয় সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিতে কিম্বা তদুপরি নির্য্যাতন
করিতে কুণ্ঠিত হয় না—ইন্দ্রিয় সেবা যাহাদের জীবনের মুখ্য
উদ্দেশ্য—যাহারা ভব জীবনকেই চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করে—
তাহাদের মৃত্যুর পরে সম্ভব হইলে ইহাপেক্ষাও দুঃসহ আজাব
হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

এক দিকে ফেরেশ্তারা আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন,
অপর দিকে জুতার অত্যধিক উষ্ণতা আমাকে জ্বালাইয়া
পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলিতেছিল। বিষধর সর্পে দংশন
করা মাত্র বিষ যেমন মস্তিষ্কে যাইয়া ক্রিয়া আরম্ভ করে, তদ্রূপ
জুতার অত্যধিক উষ্ণতা বিদ্যুৎ বেগে মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ
করিয়া আমাকে সম্পূর্ণরূপে সোয়াস্তি শূন্য করিয়া তুলিল!
আমি কি এক অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম!
অগ্নির উপর সংস্থাপিত ঘৃত যেমন অগৌণে গলিয়া যায়, তদ্রূপ
আমার মস্তিষ্কও এই অসাধারণ তেজোধারণে অক্ষম হইয়া

* প্রার্থনায়।

† ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদ জনিত দান।

‡ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

গলিয়া গলিয়া নাসিকা বহিয়া বাহির হইতে লাগিল! আমি ঈদৃশ অমানুষিক দুঃখে পড়িয়া কত কাঁদিলাম। কিন্তু কেহই আমার দিকে মুখ তুলিয়াও চাহিল না।

তৎপরে আমাকে ছাখ্‌রাত নামক পাহাড়ে স্থানান্তরিত করা হইল। দৈর্ঘ্যে সেই পাহাড় অন্যূন ত্রিশ হাজার বৎসরের রাস্তা হইবে। ত্রিশ হাজার বৎসরের রাস্তা ব্যাপিয়া এই সুবৃহৎ পাহাড় খোদাওন্দ করিম বিষধর সর্প, অজগর, বৃশ্চিক ও বিশেষ তেজোধারী কাল রঙ্গের অগ্নির দ্বারা ভরপূর করিয়া রাখিয়াছেন! এই পাহাড়ে বহুতর অগ্নিময় জলাশয় বিদ্যমান। তাহার প্রত্যেকটী অগ্নিজলে পরিপূর্ণ। এখানে স্থানান্তরিত হইলে দোজখীর কষ্টের অবধি থাকে না। ভাষায় এমন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা ছাখ্‌রাত পাহাড়ের কিঞ্চিৎ পরিমাণ আজাবেরও বর্ণনা হইতে পারে! অহো, সেই দুঃসহ বেদনা যে ভোগ করিয়াছে, সে ব্যতীত এই অসীম দুঃখ কষ্টের কল্পনা করাও অপরের পক্ষে অসম্ভব! বৃহদাকার সর্প ও অজগরগণ সাঁ সাঁ শব্দে যখন পাপীদিগকে দংশন করিতে আসে, তখন নিরুপায় পাপিগণ খোদাতালার নিকট কেবল মরণ-কামনা ভিন্ন অপর প্রার্থনা খুঁজিয়া পায় না! সেই সর্প ও অজগর সমূহ এতই বিষাক্ত যে সে বিষের বিন্দুমাত্র জগতে পতিত হইলে যাবতীয় সৃষ্টি মুহূর্ত্ত মধ্যে উৎসন্ন হইত। প্রতিদিন আমাকে তিনশত

বার সেই পাহাড়ের দুঃসহ আজাব ভোগ করিতে হইত! যখন সর্প ও অজগর সমূহের দংশনজনিত জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করা আমার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত—যখন মর্ম্মাহত হৃদয়ে "শীতলকর" "শীতলকর" বলিয়া ডাক ছাড়িতাম, তখন অবিলম্বে ফেরেস্তাগণ সেই অগ্নিময় জলাশয়ের যে কোন একটীতে নিয়া আমাকে ফেলিয়া দিত! মর্ম্মান্তিক জ্বালা পোড়ার উপর উত্তপ্ত অগ্নি জল সংযোগে আমার দুঃখ শত ধারায় বাড়িয়া উঠিত! আমি অর্দ্ধ মৃত প্রায় হইয়া পড়িতাম!

আমার এই দুঃখের অবসান হইলে মনে করিলাম, এবার আমাকে যথায় স্থানান্তরিত করা হইবে, সেখানে পৌঁছিতে পাইলেই হয়ত সমস্ত দুঃখের ভোগ ফুরাইবে। আবার হয়ত আমার সুদিন আসিবে। কিন্তু হতভাগ্যের সুদিন যে সহজে আসে না! আমাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পুনরায় গজবান নামক সুবিস্তীর্ণ ও অতলস্পর্শী একটী নাহারের * নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই নাহারের পানি দিবারাত্র যেন অগ্নি সংযোগে বক্ বক্ করিয়া ফুটিতেছিল। আমি তন্মধ্যে ফেরস্তাগণের আদেশে পদতল অভিসিক্ত করা মাত্র কে যেন সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা আমার পদতলের মাংস সমূহ নিমেষ মধ্যে ছাড়াইয়া লইল। এই পানির মধ্যে আমাকে ফেলিয়া দিলে,

*, প্রবাহিনী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমার কি অবস্থা হইবে, এই কথা ভাবিয়া আমি নিতান্ত ভীত হইতে লাগিলাম; এমন সময় বজ্র গম্ভীর নাদে মালেকের (আঃ) আদেশ হইল—"অবিলম্বে জল মধ্যে নিমজ্জিত হও।" আমি ভীত ও শঙ্কিত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে জল মধ্যে পড়িয়া গেলাম। শরীরে যত মাংস ছিল সমস্ত গলিত ও ধৌত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইল। সুতরাং কঙ্কালের মধ্য দিয়া অন্তরের অন্তস্তলে অপরিসীম ও অকথ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম! কায়িক আজাব হইতে এই মানসিক আজাব আমার পক্ষে সহস্র প্রকার অধিক কষ্ট দায়ক হইয়াছিল! সাধ্য সমতার অতীত না হইলে শরীরের পক্ষে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করা সহজ সাধ্য বটে, কিন্তু সেই কষ্টটি মানবের কোমল হইতে কোমলতর হৃদয়ে অবারিত রূপে প্রবর্ত্তিত হইলে, তাহা আর কিছুতেই সহ্য করা যায় না! এইরূপ কষ্ট ভোগ করিবার জন্য জীবিত থাকার চেয়ে মরণই বাঞ্ছনীয়! কিন্তু পরিতাপের বিষয় মরণ যে তথায় আসিয়াও আসে না।

তৎপর ফেরেশ্তারা 'জুব্বলহাজন্' নামক একটী কূপে নিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল। তথাকার আজাবও রক্ত মাংসের শরীরের পক্ষে একান্ত দুঃসহনীয়। হায়! আমার দুঃখের উপর দুঃখ যেন প্রত্যহ বাড়িতে লাগিল; মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া এই সুদীর্ঘ এক শতাব্দী পর্য্যন্ত আমার পক্ষে সুখ যেন স্বপ্নে

পরিণত হইয়াছিল! আমি যেন কত কি দুঃখের বোঝা বহন করিবার জন্যই কোন্ এক অশুভ ক্ষণে পরলোকে আসিয়াছিলাম এবং খোদাতালা সেই দুঃসহ দুঃখের মধ্য দিয়াই আমার জীবন-নাটকের পরলোক অঙ্ক অভিনয় করিলেন! হায়, সেই দুঃখের কথা স্মরণ করিতে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে—এখনও মুখ শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে—এখনও বাক্য রোধ হইবার আশঙ্কা হইতেছে—এখনও মনঃপ্রাণ শঙ্কায় ভরপূর হইয়া উঠিতেছে!"

ইসা (আঃ)। তোমার দুঃখের কথা যথেষ্ট শুনিয়াছি। আর অধিক শুনিতে চাহিয়া তোমার হৃদয়ে পুনরায় কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নহে। অতীত দুঃখের কথা স্মরণ করিলেও অন্তরে যথেষ্ট দুঃখের সঞ্চার হয়। সুতরাং তোমাকে আজাব সম্বন্ধে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিব না। তুমি এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিলে শুধু তাহাই শুনাইয়া, আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর।

জম। জুব্বলহাজন সংলগ্ন ত্রিশ ক্রোশ ব্যাপী একটী অগ্নিময় গৃহ আছে। উপরোক্ত জুব্বলহাজন্ হইতে আমাকে পুনরায় সেই অগ্নিময় গৃহে স্থানান্তরিত করিলে, আমি নিরতিশয় দুঃখ কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কষ্ট যে আমার আর কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিলাম—"হে খোদা, তুমি

মহৎ, তুমি সর্ব্ব শক্তিমান্, তুমিই ক্ষমার আধার। তুমি মানবকে সামান্য এক বিন্দু বীর্য্য হইতে সৃষ্টি করিয়া, নির্ব্বিবাদে তাহার ভব-জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হেতু, তাহাকে মাতা পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে সংস্থাপন করিয়া থাক। এবং শরীরের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাহার ধনজন ও আত্মীয়-স্বজন বৃদ্ধি করিয়া তাহার সংসারকে সুখের ভবনে পরিণত কর। বৃদ্ধ বয়সে যখন ধন-জন, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব ও সুখ-সমৃদ্ধিতে বঞ্চিত করিয়া, তাহাকে নিঃসম্বল অবস্থায় স্বীয় সিংহাসন পার্শ্বে ডাকিয়া লও, তখন তোমার শান্তিময় ক্রোড়দেশে যদি বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতে না পায়, তবে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়! মানব পাপী। তাহারা পাপানুষ্ঠান ভিন্ন থাকিতে পারিবে না; এ জন্যই তুমি রাহ্মান ও রাহিম * নাম গ্রহণ করিয়াছ। আমার আর এ কষ্ট সহ্য হইতেছে না—রক্ত মাংসের দেহ আজাবের নির্য্যাতনে প্রত্যহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে—এখন এই পাপীর প্রতি দয়া করিয়া তোমার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক মধু মাখা নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। আমার এবম্বিধ করুণ প্রার্থনায় ঈশ্বরের অন্তঃকরণে যেন হঠাৎ দয়ার সঞ্চার হইল। তাঁহার করুণ হৃদয়ের পক্ষে অধিক কাল কঠিন হইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল।"

সেই মুহূর্ত্তেই দৈববাণী হইল—"হে দোজখের ফেরেশ্তাগণ,

* পরম দয়ালু ও দাতা।

তোমরা অবিলম্বে জমজমাকে আজাব হইতে মুক্তি দান কর। তাহার এরূপ দুঃখ প্রকাশ ও কান্না কাটি আমার আর কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। সে ভবলোকে থাকিয়া পৌত্তলিক ছিল, একেশ্বর বাদে তাহার আস্থা ছিল না, তাহার দ্বারা জীবনে কখনও আমার সাধন ভজন হয় নাই ; তজ্জন্য সে যথেষ্ট শাস্তিও পাইয়াছে। কিন্তু তাহার ঈদৃশ-ধর্ম্ম শূন্য জীবন যাপনের মধ্যেও সদনুষ্ঠানের অভাব ছিল না। সে প্রতিদিন বহুতর ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিত, বহুতর বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করিয়া তাহাদের লজ্জা নিবারণের সাহায্য করিত। পিতৃ মাতৃ হীন নিরাশ্রয়গণ ও পাথেয়-হীন প্রবাসী বৃন্দ প্রার্থনা করিয়া কখনও তাহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। সে ধর্ম্ম-হীন জীবন যাপন করিয়াও এরূপ সদনুষ্ঠান করিবে জানিয়াই, আমি রোজআজলে * লিপি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, জমজমার পূর্ব্ব কৃত পাপের জন্য যথোচিত আজাব ভোগ হইলে, তাহাকে পুনরায় জগতে প্রেরণ করা হইবে।"

দৈববাণী শুনিয়া আমার শুষ্ক হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইল! মরুভূমিতে যেন হঠাৎ সত্য মরীচিকার আবির্ভাব হইল! অবিলম্বে ফেরেশ্তাগণ ঈশ্বর-আদেশানুযায়ী আমার মাথার খুলীকে আনিয়া আপনার গন্তব্য পথিমধ্যে রাখিয়া গেল।

* অদৃষ্ট সৃষ্টির দিনে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঈসা (আঃ)। এখন আমার নিকট তোমার কোন প্রার্থনা থাকিলে জানাইতে পার।

জম। আপনার নিকট আমার তিনটী প্রার্থনা আছে। প্রথম প্রার্থনা এই যে, আমাকে পুনরায় ভূতলে পাঠাইবার জন্য আপনি ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করুন। পূর্ব্বের মত অফুরন্ত আয়ুতে আমার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে যত বেশী দিন বসবাস করা যায়, পৃথিবীর মায়া মোহ প্রভৃতি নিগড়ে লোক ততই আবদ্ধ হইতে থাকে; এবং পার্থিব মায়া মোহের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের পুণ্যকার্য্য সকল সময় হইয়া উঠে না। ভব-বন্ধন এতই কঠিন জিনিস যে, এ বাঁধে আবদ্ধ হইলে লোকের আর পরিত্রাণের আশা থাকে না—মুক্তির পথ বন্ধ হইয়া যায়! তজ্জন্যই প্রার্থনা যে, আমার তেমন দীর্ঘ জীবনে আর প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব আয়ুর এক পঞ্চমাংশ হইলেই যথেষ্ট হইবে। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আমাকে একেশ্বর বাদে দীক্ষিত করুন। মাতৃগর্ভে অবস্থান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার দয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধনের এক মাত্র হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা—যিনি প্রতি নিয়ত লোকের চেষ্টার মধ্যে আত্ম গোপন করিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থান করিতেছেন; হে মহাপুরুষ, তাঁহার সেই পবিত্র নামে আমাকে চির জীবনের মত উন্মত্ত করিয়া দাও। সৃষ্ট জীবের কষ্ট দর্শন করিলে যাঁহার প্রাণ নিমেষ মধ্যে

উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, আমাকে সেই নিরাকার প্রেমময় প্রেমাস্পদের চরণে তন্ময় চিত্তে লুটাইয়া পড়িতে সাহায্য কর। ভক্তির সপ্ত সিন্ধু আমার হৃদয়ে প্রবাহিত কর। তৃতীয় প্রার্থনা এই যে, জগতে যত দিন বাঁচিয়া থাকি, ততদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও যেন এই আজাবের কথা বিস্মৃত না হই। কারণ এই দুঃখের কথা ভুলিয়া গেলেই সুখের দিকে মন টলিয়া পড়িতে চাহিবে। পার্থিব সুখের কোলে গা ঢালিয়া দিলেই মানবের মুক্তির পথ বন্ধ হইয়া যায়! আজীবন সাধনা দ্বারা মুক্তির দুয়ারে ঘন ঘন আঘাত করিতে করিতে একদিন হঠাৎ মুক্তির দুয়ার খুলিয়া যায়। মানবের হৃদয়-রূপ আর্শিতে তখন কিছুতেই পাপের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় না।

ঈসা (আঃ) এরূপ মোনাজাত করিলে তৎক্ষণাৎ খোদার দরগায় তাহা কবুল * হইল। তিনি জমজমাকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ও সাধন-ভজনের রীতি নীতি শিক্ষা দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, জমজমা দু'ফোঁটা কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ঈসা (আঃ) অগোণে নিজপথে চলিয়া গেলেন।

---

* গৃহীত।

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ দিগ্বিদিগ্ হইতে নানা জাতীয় কুসুম-গন্ধ হরণ করিয়া জগদ্‌বাসীর মনোরঞ্জনে প্রয়াস পাইতেছে। পক্ষিগণ সন্ধ্যার আগমনী গানে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। ম্লান চন্দ্রিমা ধীরে ধীরে আকাশকোলে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। দু'একটী ক্ষুদ্র তারকাও আকাশের এদিকে সেদিকে উঁকি মারিতেছে। দুষ্ট ভ্রমরগণ যেন কুসুমসৌন্দর্য্যে ঈর্ষাপরবশ হইয়াই মধু আহরণ ছলে, এ ফুলে সে ফুলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মলয়বায়ে হেলিয়া দুলিয়া বিবসনা প্রকৃতি সুন্দরী যেন কামুক-হৃদয়ের সন্তোষ সাধনে সচেষ্ট। চতুর্দ্দিকের এই শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনে হইতেছিল, সৌন্দর্য্য যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিশ্বময় শতধারে উছলিয়া পড়িতেছে।

এমন সময় উদাসীন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল—"হায়! দুনিয়া * কি ভয়ানক স্থান! এখানে লোকে লাভ করিতে আসিয়া মূলধন পর্য্যন্ত হারাইয়া যায়! কোথায় বিদেশে আসিয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা ধনবান্ হইয়া, হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিবে, আর কোথায় পৃথিবীর মায়া-মোহে আবদ্ধ হইয়া, মূলধন পর্য্যন্ত হারাইয়া, রিক্তহস্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়! এই সংসার ঈমান * হরণের এক অতলস্পর্শী সমুদ্র বিশেষ। এখানে ধর্ম্ম বল, সদনুষ্ঠান বল, ঈশ্বরচিন্তা বল, বিশ্বপ্রেমিকতা বল, যাহা কিছু নিমজ্জিত হয়, তাহার আর কোন কালে উদ্ধার সাধন হয় না! শত অনুশোচনা ও অনুসন্ধানেও তাহা আর ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হয় না। যিনি দুনিয়ার মায়ামোহে একবার প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহার মায়ামোহ জীবনে আর যেন টুটিবার নহে। ধূলার শরীর ধূলায় মিশিয়া যাইবে—যথা হইতে আসিয়াছি তথায় পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে—সংসারের সুখ-সম্পদ মহিমাময়ের মহিমার একমাত্র ইঙ্গিতে কখন কোথায় অন্তর্হিত হইবে, এ সমস্ত কথাগুলি মানবের অন্তর হইতে, সংসারের মায়া-মমতার মধ্য দিয়া কোথায় লুকাইয়া যায়! হায়, মানব কত ভ্রান্ত, তাহারা এই সংসার-জীবন

* পৃথিবী।

* অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।

কেই চিরস্থায়ী মনে করে—এই দুদিনের সুখ সম্পদের দ্বারে আত্মবিক্রয় করিয়া, চির আরামের স্থান ভুলিয়া যায়—দুনিয়ার একটুকু সুখ, একটুকু লাভের প্রত্যাশায়, আখেরাত * রূপ মহামূল্য রত্ন সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে!"

এই সমস্ত বলিতে বলিতে উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া হঠাৎ নীরব হইল। অন্ধকার যেন তাহার হৃদয়ে কি এক ভীতির সঞ্চার করিয়া দিল। সে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। অবশেষে হৃদয়কে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সংযত করিয়া সে ঈশ্বর-আরাধনায় মনোনিবেশ করিল। আজ যেন তাহার হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া গেল। অকস্মাৎ স্বর্গলোকের কি এক মনোমোহন নূরাণী জ্যোতিঃ * তাহার হৃদয়মধ্যে শত সহস্র মণি-মাণিক্যের ন্যায় ঝলসিতে লাগিল। সে সেই মধুমাখা অমরলোকের সম্মুখে ভোগ-স্পৃহা, কামনা ও মায়া-মোহময় জগতকে নিতান্ত জঘন্য বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল।

পাঠক, এই উদাসীনকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই আমাদের কথিত সেই সোলতান জমজমা। যিনি সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তাবিরহিত ছিলেন—যিনি দুনিয়াকে চির আবাস মনে

* পরলোক।

* ঐশ্বরিক রওশন সম্পন্ন বিভা।

করিতেন—যিনি স্বকীয় বাহুবল, সৈন্যবল ও সর্ব্ববেদিনী প্রতিভায়, কস্তুরি-গন্ধমুগ্ধ-মৃগপ্রায় আত্মহারা হইয়া, মনের মানুষকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন—যিনি পরলোক নামে কিছুই বিশ্বাস করিতেন না—তাঁহার জীবনের যে ঈদৃশ আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, তাহা যে ধারণারও অতীত। কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং যাঁহার মঙ্গল কামনা করেন—তিনি যাঁহাকে পাপ সত্ত্বেও মুক্তি দিবার ইচ্ছা করেন—তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন করা সেই সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষে সময়সাপেক্ষ নহে। পক্ষান্তরে, সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবগণ কুপথ-সুপথ একাকার জ্ঞানে, এদিকে সেদিকে বিচরণ করিয়া, পর্ব্বত হইতে সদ্যঃ প্রবাহিত স্রোতস্বিনী সদৃশ, চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন একান্ত কাতর ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন তাঁহার জীবনে পরিত্রাণরূপ মহা সমুদ্র-সঙ্গম সংঘটিত হইয়া থাকে। পাপের দুর্ভোগও কাহাকে কাহাকে কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন করিতে দৃষ্ট হয়। আমাদের জমজমার জীবন কতকটা শেষোক্ত প্রকারের। জমজমা পাপের দুর্ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর এখনও এক অহোরাত্রও অতীত হয় নাই—দোজখের ভীষণ আজাবের কথা মাঝে মাঝে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া এখনও তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে সূচিবিদ্ধ করিতেছে—এখনও আজাবের বিভীষিকা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্যে ঘুরিয়া বেড়াই

তেছে ; সুতরাং সে যে ভয় ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা সম্ভব হইলে ঈশ্বর-প্রীতি-মুগ্ধ হইয়া, তৎসেবায় সম্পূর্ণ মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

ঈসা (আঃ) প্রস্থান করার পর হইতে বহুদিনের অবরুদ্ধ চিন্তা ও ঔদাসীন্য আসিয়া, প্রবল বন্যার ন্যায় কখনও কখনও তাঁহার হৃদয়কে যেন একএক বার ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল। মাঝে মাঝে তিনি আবার সেই ছিন্ন ভিন্ন হৃদয়কে ঘুচাইয়া লইয়া, ঈশ্বর-আরাধনায় মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। এইরূপ উৎকণ্ঠা ও আরাধনার ভিতর দিয়াই তাঁহার রাত্রি যাপন সমাপ্ত হইল ! যেই চক্ষুর্দ্বয় সমস্ত রাত্রি ও দিবসের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নিদ্রালসভাবে কাটাইয়া দিতে ভালবাসিত, জাগরণ কাল যাঁহার খাওয়া, পরা, বিলাসিতা, উপভোগ ও রাজকার্য্য পরিদর্শনে কাটিয়া যাইত, তাঁহার আজ চক্ষে নিদ্রা নাই, বসন-ভূষণের প্রতি লক্ষ্য নাই, তাঁহার সেই পাপময় হৃদয়ে উপভোগ কিংবা সংসারচিন্তার এখন আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না ! হায়, কালের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ! ঈশ্বর-ভক্তির কি অমানুষিক শক্তি ! !

দুগ্ধ-ফেন নিভ সুকোমল শয্যা, অসংখ্য নয়ন-মনঃ-প্রীতিকর রাজকীয় আস্‌বাব, মনের উন্মাদিনী শক্তিবর্দ্ধক পান-পাত্র এবং নজোয়ান বেগম সাহেবাদের নানাবিধ উত্তেজনা-শান্তিকারক ও চিত্তাকর্ষক খেদমতের * মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও যাঁহার

* পরিচর্য্যা।

অতৃপ্ততা হেতু নিদ্রাকর্ষণ হইত না, তাঁহার পক্ষে আজ ধূলি-শয্যাই যথেষ্ট! ইহাতেই যেন তাঁহার তৃপ্তি ও আরাম উভয়ই অনুভূত হইতেছে! ইহাকেই বলে ঈশ্বরপ্রেম! এই ঈশ্বর-প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই সোলতান ইব্রাহিম আদ্হাম ও সোলতান বায়েজিদ বোস্তামী স্বর্ণময় তাকীয়া ও রজতশুভ্র সুকোমল গালিচা-দলিচা এবং তখ্ত তাজের † বিনিময়ে অনায়াসে ও আনন্দিতচিত্তে ধূলিশয্যা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন! কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদের জীবনের সহিত আমাদের কথিত জমজমার জীবনের সৌসাদৃশ্য নাই। কারণ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা ও রাজভোগ যে চিরস্থায়ী নহে—ইহাতে যে আত্মার সম্যক্ সুখ সাধন কিংবা মুক্তির উপায় হয় না—তাহা ইঁহারা সময় থাকিতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে যদি ঈশ্বরের উপর কথঞ্চিৎ ভক্তি থাকে; তাহা হইলে ঘটনাবিপর্য্যয়ে পতিত হইয়া কিংবা উত্তরোত্তর উপ-ভোগেও সঞ্জীবন অভীপ্সিত স্থায়ী সুখ-শান্তি লাভে বঞ্চিত হইয়া, ঈশ্বরপথে আগমন সহজসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জমজমার পূর্ব্বজীবনে ঈশ্বর-ভক্তি বলিতে যে কখনও কিছু ছিল না! সুতরাং ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত না হইলে, অঙ্কুর উদ্গম হওয়া যে একান্ত অসম্ভব।

---

† সিংহাসন ও শিরোবেষ্ট।

দশম পরিচ্ছেদ।

সিরিয়ার কোন বৰ্দ্ধিষ্ণু জনপদে এক ধনী-দুহিতা তাঁহাদের সুরম্য ত্রিতলের ছাদে আরাম-কেদারায় উপবেশন করিয়া বায়ুসেবন করিতেছিলেন। রমণী তাঁহার অনুপম রূপ-লাবণ্যে যেন ধরণীর অশেষবিধ শোভা-সৌন্দর্য্যকে উপহাস করিতেছিলেন। তাঁহার ভূলুণ্ঠিত অবেণী-সংবদ্ধ কেশদাম পবন ভরে চতুর্দ্দিকে হেলিয়া দুলিয়াও সেই সুদৃশ্য মস্তক ও লাবণ্যময় বদনকমল হইতে বাত্যা-বিতাড়িতা ব্রততীর ন্যায় যেন কিছুতেই আশ্রয়-তরু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিতেছিল না। কুঞ্চিত অলকাগ্রে রেশমী ফিতায় বাঁধা দুষ্প্রাপ্য বস্‌রা-গোলাব, বৃন্ত-চ্যুত হইয়া সামান্য মাত্রায় মলিন হইলেও, তখনও যেন তদীয় যৌবন-সহচর ভৃঙ্গরাজকে ডাকিয়া ডাকিয়া আকুল হইতেছিল। সুন্দরীর তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত বদনকমল অস্তরঙ্গিন সন্ধ্যা-সতীকে

যেন একএক বার অলক্ষিতে ম্রিয়মাণা করিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছিল; মনোজ্ঞ তিলোত্তমা রূপের পূর্ণযৌবনভার তদীয় কমনীয় দেহলতা যেন আর কিছুতেই বহন করিতে পারিতেছিল না। তিনি শোভা-সৌন্দর্য্যের সেই সুদৃশ্য মঞ্চে উপবেশন করিয়া মদিরগন্ধময় সন্ধ্যানিলস্পর্শে যেন কি এক উন্মাদনার বশবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া পড়িলেন। কোথা হইতে যেন এক কল্পিত স্বর্গলোকের মনোরম স্বপ্নময় জড়িমা এক এক বার অলক্ষিতে তাঁহার অক্ষিপল্লব নিমীলিত করিয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল। দিনমণি কার্য্য-ক্লান্ত হইয়া অস্তাচলপথে যাইতে যাইতেও যেন ফিরিয়া ফিরিয়া সুন্দরীর অপরূপ রূপলাবণ্যের প্রতি অতৃপ্ত কটাক্ষ হানিতেছিল।

দিবাকর অস্তমিত হইলে চন্দ্রমার স্নিগ্ধালোকে আবার জগৎ হাসিতে লাগিল। আঁধার ও আলোর সংমিশ্রণে সুন্দরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যেন অধিক মাত্রায় ফুটিয়া উঠিল। হীরা, পান্না, চুণী, অয়স্কান্ত ও পদ্মরাগমণির জড়াও অলঙ্কাররাজি তাঁহার জ্যোৎস্না-স্নাত রূপ-নদীতে যেন বান ডাকিয়া যাইতেছিল! বহুমূল্য প্রস্তরখচিত অলঙ্কারাবলী, আকাশ-চত্বরে তারকারাজির ন্যায় ঝিকিমিকি করিয়া সৌন্দর্য্যের অস্ফুট অংশটুকুকে যেন বিকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। তদুপরি

তদীয় স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তি চঞ্চল যৌবনোপরি গাম্ভীর্য্যের ছায়া পাত করিয়া সেই ক্ষণিক শোভার আসনখানি যেন উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া দিতেছিল।

এমন সময় সতর্ক পদবিক্ষেপে জুমেলা হোসায়নীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হোসায়নী তাঁহাকে যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি তখনও তাঁহার কল্পিত ভাবী-জীবনের মনোজ্ঞ চিত্রখানায় নানারূপ রং ফলাইবার চেষ্টা পাইতেছিলেন।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জুমেলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হোসায়নী, আজ তোমাকে এত অপ্রকৃতিস্থ দেখ্‌ছি কেন?"

কর্ণকুহরে জুমেলার আকস্মিক শব্দ প্রবেশে হোসায়নীর যেন চেতনা সঞ্চার হইল। তিনি তাঁহার বদনকমল হইতে বহু-ক্ষণের চিন্তারাশি নিমেষমধ্যে সতর্কতার সহিত অপসারিত করিয়া স্মিত মুখে উত্তর করিলেন—"কই জুমেলা, এমন ত কিছু নয়!"

"না সখি, আমি বুঝ্‌তে পে'রেছি। তোমাকে যে দিন থে'কে সকল কাজে একটু অসতর্ক দেখেছি—যে দিন থে'কে তোমার নিষ্কলঙ্ক ললাটদেশে সময় সুযোগ মত, একটু আধটু চিন্তার রেখা অঙ্কিত হ'তে দেখেছি—যে দিন থে'কে তুমি একান্তে নির্জ্জনে ব'সে থাক্‌তে বড়ই ভালবাস্‌ছ, সেইদিন থে'কে বুঝ্‌তে পে'রেছি তুমি হয়ত কাহারও নিকট আত্মবিক্রয় ক'রে ফেলেছ।

তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দে'খে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হ'চ্ছে যে আমার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য।"

হোসায়নী ভাবিল—"জুমেলা হয়ত সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছে। আমার হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক দুঃখ কষ্টে সহানুভূতি জ্ঞাপন করা কিংবা আমার অভীষ্ট সাধনে সাহায্য করাই হয়ত জুমেলার একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁহার নিকট এ কথাটি গোপন করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া হোসায়নী উত্তর করিলেন—"প্রাণের জুমেলা, তোমার নিকট গোপন করার আমার কিছুই নাই। সুতরাং সমস্ত খু'লে বল্‌ছি; মনোযোগ সহকারে শোন—

ঐ যে একটী যুবক মাঠের মধ্যে দিবারাত্র ব'সে থাকে—কি সুন্দর তাহার মনে-আসে-মুখে-আসেনা গঠনপ্রণালী,—কি সুন্দর তাহার কি-জানি-কেমন কটাক্ষ—কি সুন্দর তাহার স্থির প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি! ওকে দেখা অবধি, জুমেলা,—-!"

"সখি, বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু এই সংসারবিরাগীকে ভালবেসে সুখী হ'তে পারবে কিনা জানি না।"

"পিতার মৃত্যু হ'তে এই অপরিসীম বিষয় বিভবের মধ্যে বসবাস করেও ত কই নিমেষের জন্য সুখী হ'তে পারিনি। না হয় দুঃখী জীবন দুঃখেই কে'টে যাবে। তাই ব'লে চক্ষু যা'কে প্রাণের ক'রে নেবার জন্য এত অনুনয় বিনয় করছে—যাহার

সহিত প্রাণ বিনিময়ের জন্য এত চঞ্চল ও সোয়াস্তিশূন্য হ'য়ে উঠেছি—যা'কে সকাল সন্ধ্যা না দেখ্‌লে কিছুতেই শান্তি হয় না, তা'কে ত কিছুতেই ভুল্‌তে পারব না। তুমি হয়ত ব'ল্‌বে সে সহায়-সম্বলহীন, সে ভিখারী। কিন্তু আমি তার দারিদ্র্যের মধ্যেও সম্পদ অনুভব কর্‌ছি—তার ব্যর্থ জীবনের মধ্যেও সফল-তার কনকরেখা দেখ্‌তে পাচ্ছি—তার উদাস দৃষ্টির মধ্যেও দিব্য প্রেমের জ্যোতি দেখ্‌ছি—তার ত্যাগী জীবনের মধ্যেও ভোগের নির্ব্বাণোন্মুখ আকাঙ্ক্ষা অনুভব কর্‌ছি—আমার চক্ষে তাহার সমস্তই সুন্দর!"

"বিবি, তবে তৎ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করেছ?"

"সিদ্ধান্ত কি করেছি শুন্‌বে? সিদ্ধান্ত করেছি—আমার সমস্ত তাহার পায়ে ডালি দিয়ে তা'কে আমার নিজের ক'রে নেব। ধন-দৌলত, সুরম্য-প্রাসাদ ও এই প্রেমপ্রত্যাশী যৌবন, সকল দিয়েও যদি তাকে পাই, তবে নিজকে ধন্য বিবেচনা কর্‌বো।"

"আমি বুঝি এতে তোমার আয়াস পে'তে হবে না। এই ভিখারী ধন-লোভে হো'ক কিংবা তোমার অনিন্দ্য সুন্দর যৌবন-রূপ-মোহে মুগ্ধ হ'য়েই হো'ক, প্রস্তাব শ্রবণ মাত্র তোমাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌বে।"

"এখন কথা হ'চ্ছে প্রস্তাবটা কিরূপে উত্থাপন করি? এক একবার মনে কর্‌ছি পাড়ার মেয়েরা যেমন ফকির দর্শনে যায়,

তুমি আর আমি তেমনি তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'ব। সময় ও সুযোগ বু'ঝে, বিপুল বিষয়-সম্পদ ও যৌবনের প্রলোভন দেখিয়ে, বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা কয়টী তাঁর কাণে প্রবেশ করা'তে পারলেই কাজ ফতে।"

"তবে আজই চল গিয়ে দেখি। উপযাচিকা হ'য়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়া তোমার ভাল দেখাবে না। আমি তোমার হ'য়ে সমস্ত করবো।"

জ্যোৎস্না রাত্রি। চতুর্দ্দিক্ নীরব নিথর। আকাশপ্রাঙ্গণে তারকারাজি স্বর্গীয় বিমল জ্যোৎস্না সর্ব্বসাধারণকে বিলাইতে বিলাইতে ক্লান্ত হইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। কানন-কুন্তলা প্রকৃতি রাণী পশু-পক্ষীর কলরবে এখন আর মুহুর্ম্মুহুঃ মুখরিতা হইতেছে না। এখন পথ চলিতেছে কা'রা?—দস্যু, তস্কর, গুপ্তপ্রণয়ী ও অভিসারিণী রমণীবৃন্দ।

এমন সময় হোসায়িনী চুপি চুপি জুমেল্লাকে বলিল—"আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই ; চল এবার যাওয়া যা'ক।"

হোসায়িনী মৃদু মন্থর গতিতে ত্রিতল হইতে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে অবতরণ করিতে লাগিলেন। জুমেলা আর কথামাত্র না বলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পথি মধ্যে কি বলিয়া প্রথম কথা উত্থাপন করিতে হইবে, উভয়ে মনোমধ্যে তাহাই পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল—

প্রথমে সেবাধর্ম্মের নাম করা হইবে। তৎপরে ফকিরের আগ্রহ মত বিষয় বিভবের প্রলোভন দেখাইয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করা হইবে।

ফকির-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া হোসায়িনী ও তদীয় সহচরী ভূলুন্ঠিতা হইয়া তাঁহার পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। ফকির তৎ-কালে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া সম্মুখে এই ষোড়শী যুবতীদ্বয়কে দর্শন করত অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"ইহাদের এই গভীর রাত্রে নির্জ্জনে আমার নিকটে আসিবার কারণ কি?" প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করি-লেন—"মাতৃগণ, তোমরা কি বিপদগ্রস্তা?"

জু। না হুজুর, আমরা বিপদগ্রস্তা নই। আমরা আপনার খেদমত করিব বলিয়াই আসিয়াছি। আশা করি ইহাতে হুজুরের কোন আপত্তি থাকিবে না।

ফকির। তোমাদের খেদমতে আমার আবশ্যক নাই। আমি জগতের আরাম-আয়েস বলিতে সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছি। যাহাতে মনের মধ্যে লালসা বা উত্তেজনার সঞ্চার হয়, সে সমস্ত কার্য্য এখন অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি। সময় সময় পুরুষদের সংসর্গ পর্য্যন্ত আমার ভাল বোধ হয় না—স্ত্রীলোক ত দূরের কথা। নির্জ্জন এত ভালবাসি কেন শুনিবে? নির্জ্জন মনের ঐকান্তিকতা রক্ষা করে—পাপের মধ্যে পুণ্যের ছবি আঁকিয়া

৮

দেয়—ধ্যানকে উচ্চ হইতে উচ্চতর আসনে উন্নীত করে। তোমরা আমার সেই সুখ শান্তির পথে বৈরী হইতে চাহিতেছ কেন? আমাকে বিপথগামী করিবার প্রয়াস পাইলে বল ত তোমাদের কি লাভ হইবে? আমি পূর্ণ চারিশত বৎসর নানারূপ সুখভোগে লিপ্ত ছিলাম, যতরূপ সুখভোগ হইতে পারে সকল-টারই চরমে পৌঁছিয়াছিলাম—তজ্জন্য বেশ শিক্ষা লাভও হইয়াছে! অহো! সে সমস্ত দুঃখভোগের কথা মনে হইলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে! তোমরা বৃথা চেষ্টা করিতেছ! আমি আমার চঞ্চল যৌবন ও ক্ষুদ্র জীবনকে পুনরায় পাপ-পুণ্যের সঙ্গমস্থলে লইয়া দাঁড় করাইতে ইচ্ছা করি না। কামিনী-কাঞ্চনকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিব এ আশা পোষণ করিয়া তৎ-সন্নিকটে অবস্থান করত আত্মপরীক্ষা করিতে যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে। তাহাতে হয়ত কোনদিন অলক্ষিতে হৃদয়ে পাপের বীজ উপ্ত হইতে পারে। উত্তাল তরঙ্গমালা পরিপূর্ণ সাগর মধ্যে অকস্মাৎ ঝড়-বৃষ্টি ও ঘুর্ণিবায়ু আরম্ভ হইলে যেমন সময় সময় বিশেষ বিচক্ষণ নাবিকের নৌকাও তলাইয়া যায়, তদ্রূপ এ সমস্ত প্রলোভন চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া আত্মপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে কখনও কখনও নিতান্ত সংযমী পুরুষের চরিত্রও লালসা-ঝটিকার তাড়নায় পাপ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

জোসায়িনী আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"তবে ভালবাসা কি পাপ ?"

ফকির। নিশ্চয়ই না। জগতে যদি কিছু স্বর্গের সোপান থাকে তবে তাহা ভালবাসা,—যদি মুক্তির পথ কিছু থাকে তবে তাহা ভালবাসা,—যদি ঈশ্বর-প্রাপ্তির কোন প্রশস্ত উপায় বিদ্যমান থাকে তাহাও ভালবাসায়। ভালবাসায় লোক আত্মবলি দিয়া পরকে বুকে তুলিয়া লয়—পরের অভাব নিজের বলিয়া অনুভব করে—পরের সুখে আত্মপ্রসাদ গণ্য করিয়া সুখী হয়। ভালবাসা স্বর্গের ধন। ভালবাসার পায় যদি আত্মোৎসর্গ করিতে পার—নিষ্কাম ভালবাসার আলোতে যদি জীবন উজ্জ্বলতর করিতে পার—ভালবাসার বশবর্ত্তী হইয়া যদি একটি প্রাণ নিঃসঙ্কোচে লক্ষ লোকের মধ্যে বিলাইয়া দিতে পার—তবে সেই দিন বুঝিবে জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইল—সেই দিন বুঝিবে মানবত্ব রেদওয়ানত্বে * পরিণত হইল। কামনার ভিতরে প্রকৃত ভালবাসার স্থান সঙ্কুলান হয় না। কামনা এত ক্ষুদ্র, এত নীচ, এত ঘৃণ্য যে, তদুপরি পবিত্র ভালবাসার ছায়াপাত হওয়াও সম্ভবপর নহে। নিষ্কাম ভালবাসা হৃদয়ে স্থান দাও, দেখিবে জীবন স্বর্গীয় অমল ধবল কিরণ-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবকে হৃদয়ের একাধীশ্বর পদে বরণ করিয়া

* ফেরেশ্‌তা-ভাবাপন্নে।

কি হইবে? সমস্ত বিশ্ববাসীকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর—ঈশ্বর-আরাধনা জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ কর। তবে কিনা তোমাদের হৃদয় যদি এতটা প্রশস্ত হওয়া অসম্ভব হয়, আত্ম-দমন করিতে যদি অপারক হও, তবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গ্রহণ কর—স্বামী-সেবায় মনঃপ্রাণ উৎসর্গ কর—ঈশ্বর-পদে অটল বিশ্বাস স্থাপন কর;—তাহাতেও সুখ-শান্তি পাইবে—তাহাতেও জীবন পবিত্র বলিয়া অনুভূত হইবে—তাহাতেও মুক্তির উপায় হইবে।

কল্য প্রভাতে যাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে, তিনি যেমন যে কোন বিষয়ে বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাধারণতঃই শঙ্কিত হইবেন, আমারও ঠিক তদবস্থা। মৃত্যু যেমন আমার সঙ্গে সঙ্গে কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া পদে পদে অনুভব করিতেছি! এই দুঃখের হৃদয় লইয়া তোমাদের কিছুতেই সুখ হইবে না। তোমরা ভোগী, আমি ত্যাগী; তোমাদের যাহাতে সুখানুভব হইবে আমার তাহাতে বিতৃষ্ণা। এতদবস্থায় আমার দুঃখের বোঝা শিরে ধারণ করিবার জন্য আর এক পদও অগ্রসর হইও না।

আমি ধ্যান-বলে বুঝিতে পারিতেছি তোমরা অর্থের লোভ দেখাইয়া আমাকে পাপের পথে টানিয়া লইতে চাহিতেছ। কিন্তু আমি সংসারবিরাগী; অর্থে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অর্থের অভাব কিংবা আবশ্যকতা যদি আমার অনুভূতি থাকিত,

তবে তোমাদের এতাদৃশ দুরভিসন্ধি-পূর্ণ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করাও হয়ত আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত। অর্থজনিত তপ্ত-কামনা-বহ্নি ও বিষয়-বাসনা হৃদয়ে স্থান দিয়া দেখিয়াছি, সুখী হইতে পারি নাই। মনঃপ্রাণ শয়তানের প্ররোচনায় যাহা সুখের হেতু ও স্বর্গের সোপান বলিয়া গণ্য করে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। অর্থ ও বিষয় সম্পদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যদি এই ক্ষুদ্র জীবন পরোপকারে কাটিয়া যায় তবেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন হইল বলিয়া জ্ঞান করিব। যদি একদিনও একটী ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খল মানবকে সুপথে আনয়ন করিতে পারি—যদি একদিনও কাহারও দুর্দ্দম কামনা-হুতাশনে এক বিন্দু জল সিঞ্চন করিতে পারি—যদি একদিনও এই নশ্বর জীবনের সামান্য শক্তি-সামর্থ্যে কোন ভয়ার্ত্তকে অভয় দান করিতে পারি—যদি একদিনও কোন বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি এবং অবশিষ্ট সময় যদি একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর-আরাধনায় মগ্ন থাকিতে পারি; তবেই ত জীবনের আর কোন কর্ত্তব্য বাকি রহিল না বলিয়া বিবেচিত হইবে। এখন বুঝিয়া দেখ দেখি, অর্থ লইয়া আমার কি হইবে?

তোমাদের অর্থ আছে; অর্থের সদ্‌ব্যবহার কর—নিরন্নের অন্ন সংস্থান করিয়া দাও—বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিয়া সাহায্য কর—সর্ব্ব-

সাধারণের নৈতিক-শিক্ষা ও সদনুষ্ঠানকল্পে মুক্তহস্ত হও—পবিত্র পরহিতব্রত গ্রহণ কর। ধরণীতে থাকিয়া সৎকার্য্য, সদনুষ্ঠান ও ঈশ্বরারাধনার মধ্য দিয়া জীবনকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে—মহান্ আদর্শ চক্ষের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃদয়ে বেহেশ্তের ছবি আঁকিয়া লও। তাহাতে পাপ দূরে যাইবে—হৃদয় স্বর্গীয় বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হইবে। যাও মা আমার, উপদেশ সমূহের যদি কিছু লইয়া সুখী হইতে পার, তাহার অন্বেষণ করগে।

জুমেলা এই সমস্ত উপদেশ শুনিতে শুনিতে ভাবের আবেশে তন্ময় ও তদ্গতচিত্তা হইয়া গিয়াছিল। সে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। হোসায়িনীর মুখ দিয়া শুধু এই কথাটি শুনা গেল—"হে আমার দীক্ষা-গুরু, আশীর্ব্বাদ ও পদধূলি দানে আমাকে পবিত্র কর। বিশ্বহিতৈষণা, সেবাব্রত, পরোপকার ও ঈশ্বর আরাধনার সম্মুখে কামনার হীন শক্তিকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া দাও!"

ফকির সোলতান জমজমা তদর্থে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কুমারীর কলুষিত হৃদয়ে স্বর্গের ছবি অঙ্কিত হইয়া গেল। যাবতীয় কামনা একমুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। কুমারী যেন নবজীবন লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

উপসংহার।

সোলতান জমজমা পুনর্জীবন লাভের পর সংসারের মায়া-মোহ হইতে দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে, আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। খাওয়া পরার জন্য তিনি কখনও ব্যস্ত হইতেন না; খোদাওন্দ করিম গায়েব * হইতেই তাহার বিধান করিতেন। তিনি দিবা রাত্রির মধ্যে সকল সময় কেবল ঈশ্বর-চিন্তা ও ঈশ্বর-আরাধনাতেই অতিবাহিত করিতেন। কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদাই রোজা রাখিতে ভালবাসিতেন। জীবনের এক মুহূর্ত্তও যাহাতে বিফলে কাটিয়া না যায় সেজন্য বিশেষ সতর্ক ছিলেন। ফলতঃ এই কঠোর সংযম ও ঈশ্বর-আরাধনা তাঁহার জীবনে সফলতা আনয়ন করিয়াছিল। এই দীর্ঘ অশীতি বৎসরের মধ্যে কখনও তাঁহার সুনিদ্রা হইয়াছিল কি না সন্দেহ! দস্যু নেজামুদ্দিন পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য পরিতাপ ও অনুশোচনা করিতে করিতে যেমন আউলিয়া † পদবাচ্য হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অনুতাপ ও নরকাশঙ্কা জমজমার জীবনকে অগৌণে সফলতার উচ্চচূড়ে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল।

---

* অদৃশ্য।

† বিশেষ সিদ্ধ পুরুষ।

জমজমা এই অশীতি বৎসরের বসবাসের জন্য কোন গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। ধরিত্রী তাঁহার শয্যা ছিল; উপরের উন্মুক্ত আকাশ ছাদের কাজ করিত; উন্মুক্ত সূর্য্যকিরণ, চন্দ্র-জ্যোৎস্না ও অবারিত বায়ুরাশি তাঁহাকে সতত স্বর্গের পথে ডাকিয়া লইত। তাহাতেই তিনি যেন কত সুখ শান্তি ও আরাম * অনুভব করিতেন। যে দুঃখ-দৈন্য ও অভাবের মধ্যে পতিত হইলে, লোকজন সাধারণতঃ সৎপথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, সেই দুঃখ-দৈন্য ও অভাবকেই জমজমা ঈশ্বরের মহৎ আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর-কালে ঈশ্বর যে, ধর্ম্মের পরম সহায় দরিদ্রতা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করেন নাই, সেজন্য তিনি সর্ব্বদা শোকর গোজারী করিতেন। কেহ কখনও টাকা পয়সা আনিয়া দিলে, তিনি তাহা নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুই হস্তে দান করিতেন। অর্থ অলক্ষিতে তাঁহার জীবনব্যাপী সংযমের পথে বাধা বিঘ্ন আনিয়া ফেলে, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন।

জীবনের ঈদৃশী সদ্ব্যবহার, শোকর গোজারী ও আরাধনার মধ্য দিয়াই জমজমার জীবন-সূর্য্য পুনরায় অস্তোন্মুখ হইয়া উঠিল! আজরাইল (আঃ) ঈশ্বরের নামাঙ্কিত বেহেস্তের একটি মেওয়া †

* তৃপ্তি

† স্বর্গীয় সুস্বাদু ফল।

দেখাইয়া, বিনা কষ্টে পরম সমাদরে তাঁহার অন্তরাত্মাকে পরলোকে লইয়া আসিলেন। মোমেন মৃতাত্মার সম্মানার্থে সপ্ত স্তবক আকাশের দ্বার উন্মুক্ত হইল! ফেরেশ্তা ও হুর-গেলেমানগণ আজরাইলের (আঃ) হস্তস্থিত রুহ্ আচ্ছাদন বস্ত্রের স্বর্গীয় সৌরভে মুগ্ধ হইয়া 'মারহাবা' 'মারহাবা'-ময় ললিত ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিকে যেন আনন্দের প্রবাহিনী প্রবাহিত করিল। বেহেস্ত-প্রাপ্ত সাধক ও পুণ্যাত্মাগণ মোমেন মৃতাত্মার প্রতি সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন! স্বর্গ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল! আতর-গোলাব ও মোস্ক-আম্বরের সুগন্ধে চারিদিক ভরপূর হইয়া উঠিল! জমজমা স্বর্গসুখে সুখী হইলেন!

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৭ম	মেঘদৃশ	মেঘসদৃশ
”	১৩শ	যুদ্ধ	যুদ্ধ
৮	১৮শ	প্রতিষ্টিত	প্রতিষ্ঠিত
১৫	১৮শ	করিল না	করিলেন ন
২০	৪র্থ	অভিষিক্ত	অভিসিক্ত
৪২	১০ম	সঙ্কুচিত	সঙ্কোচিত
৪৭	৯ম	অনভীপ্সিত	অনভীপ্সিত
৫০	৩য়	অভিষিক্ত	অভিসিক্ত
৫২	১৩শ	পৃথিবী—	পৃথিবীর
৫৬	১০ম	যাওয়	যাওয়া
”	১৩শ	পৌছিবার	পৌঁছিবার
৫৭	৪র্থ	মুহূর্তেই	মুহূর্তেই
৫৮	১ম	কবিয়া	করিয়া
৬০	১৮শ (ফুট নোট)	জলনার্থ	জালনার্থ
৬৩	হেড্ লাইন	...	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
৭৬	২য়	মুহূর্ত্তে	মুহূর্ত্তে
”	১৩শ	কালী-রূপে	কালী রূপে
৮৫	১০ম	মূহূর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
”	১১শ	মৃত্তিকা	মৃত্তিকা
”	১৩শ	”	”
৮৮	২০শ	সকলেহ	সকলেই